মানুষের ইতিহাস

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education for class VIII of all schools of West Bengal for the year 1983 Vide Submission No. Syll. H/VIII/82/I dated 28.12.82

মানুষের ইতিহাস

(আধুনিক যুগ)

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ,, পি-এইচ্, ডি, (লণ্ডন)

প্রাক্তন অধ্যাপক ও রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; অস্থায়ী অধ্যাপক এলমায়রা কলেজ, নিউ ইয়র্ক স্টেট এবং অস্টিন কলেজ, শেরম্যান, টেকসাস্ স্টেট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

শ্রীবিভাসচন্দ্র মিত্র, এম, এ,, বি-টি, ডিপ্-ইন-এড্ (লীডস্)

প্রধান শিক্ষক, মিত্র ইনস্টিটিউশন্ (মেইন), কলিকাতা

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

সপ্তদশ অধ্যায়

আধুনিক যুগ

ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন

আমরা দেখেছি মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ সামন্ততন্ত্রবাদকে (ফিউডালিজম্) কেন্দ্র করে। এই সামন্ততন্ত্রবাদই ছিল মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। তখন দেশে ধনোৎপাদনের একমাত্র উৎস ছিল জমি আর সেই জমি থেকে যা আয় হ'ত তার বেশীর-ভাগই জমা হ'ত সামন্তপ্রভুদের সিন্দুকে। ফলে একদিকে অর্থের প্রাচুর্যে সামন্তপ্রভুরা যখন দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছিলেন অপর দিকে দেশের আপামর জনসাধারণ তখন সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও দুবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছিল না। এই ছিল মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক চিত্র।

মধ্যযুগের শেষের দিকে এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়ে যায়। তখন পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়। দেশবিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে তারা খুব বিত্তশালী হয়ে ওঠে। ফলে, দেশে এই ধনী বণিকশ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে। দেশের রাজারাও তাদের বিশেষ খাতির করতেন। ইতিহাসে এই যুগের নাম দেওয়া হয়েছে বণিকযুগ। এই যুগকেই বলা যায় ধনতান্ত্রিক যুগের আদিকাল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতি যেমন গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ সামন্ততন্ত্রবাদকে কেন্দ্র করে, তেমনি বর্তমান যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে ধনতন্ত্রবাদকে আশ্রয় করে। এইভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের সূচনা হয়েছিল।

সামন্তপ্রথার অবক্ষয়

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘকালকে বলা যেতে পারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সুবর্ণযুগ। তার পর থেকেই এর পতন শুরু হয়। রাজারা সামন্তদের প্রধান হলেও এদের স্পর্ধা ক্রমেই তাঁদের অসহনীয় হয়ে উঠছিল। অর্থবলে বলীয়ান সামন্তপ্রভুরা কার্যতঃ রাজ্যের প্রধান হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে থাকে। সুযোগ পেলেই তাঁরা অধীনস্থ সামন্তদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত ক'রে নিজেদের শাসনাধীনে

আনতেন। বড় বড় সামন্তদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকত। তাদের দুর্দমনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নে কৃষক ও বণিকেরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই তারা তখন রাজপক্ষ অবলম্বন করে। রাজারাও তখন সাধারণ লোকজনদের নিয়ে এক একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করতে থাকেন। তাই যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে রাজাদের তখন আর কোনও শ্রেণীর সামন্তদের ওপর নির্ভর করতে হ'ত না। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নানারকম আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। এর ফলে রাজারা সামরিক বলে আরও বলীয়ান হয়ে উঠলেন। তখন একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের রাজাদের অনেক সুবিধে হল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ছোটবড় বহু সামন্ত ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এজন্য তাঁদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই এঁদের অনেকে তখন নিজস্ব জমিজমা বিক্রি ক'রে ফেলেন। আবার অনেকের জমিজমা দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যায়। বহু সামন্ত যুদ্ধে নিহতও হন। ফলে এঁদের শ্রেণীগত প্রভাব প্রতিপত্তিও অনেক কমে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন শহর দিন দিন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে থাকে। শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতাহ্রাসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থের বিনিময়ে শহরবাসীরা প্রভুদের কাছ থেকে নানারকম সুযোগসুবিধা আদায় ক'রে নিতে থাকে। এইভাবে অনেক শহর নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলবার অধিকার লাভ করেছিল।

কৃষির উন্নতি

মধ্যযুগে ইউরোপের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। কৃষিকার্য ও পশুপালন ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। চাষবাসের উপকরণগুলি ছিল অত্যন্ত সেকেলে। কাঠের ফলাযুক্ত লাঙল চাষীরাই টেনে জমিতে চাষ দিত। ক্রমে মানুষ গরু অথবা ঘোড়া লাঙলে জুড়ে জমি চাষ করবার কৌশল আবিষ্কার করে। খাদ্যের জন্যে এরা গমের চাষই বেশী করতো। প্রথম প্রথম হাতের জোরে জাঁতা ঘুরিয়ে এরা গম পিষত এবং তাই দিয়ে রুটি বানাত। দ্বাদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে বাতাসের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে (wind-mill) গম পেষাই রীতি আবিষ্কৃত হয়। তারপর তা' অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। তখনও জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শস্যচাষ করবার রীতি জানা ছিল না। তাই জলাভূমি পরিষ্কার ক'রে কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। জলচাকা (water-mill) ব্যবহার ক'রে তারা এই কাজ সম্পাদন করতো।

নতুন নতুন ফসল উৎপাদন

মুসলিম জগৎ থেকে নতুন নতুন শস্য ও শাকসবজির চাষের প্রবর্তন এই সময়কার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ধান, আখ, তুলা, পালংশাক, কলা, লেবু, কমলালেবু, পীচ্, খুবানী ইত্যাদি।

শিল্পের উন্নতি

ধর্মযুদ্ধের পর থেকে মুসলিম জগতের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত শহরবাসী বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বেড়ে গিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন শহর ও বন্দরের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে ইওরোপীয় শিল্পীরা প্রাচ্যদেশের শিল্পীদের অনুকরণে নানারকমের শিল্পদ্রব্য নিজেরাই তৈরী করতে শুরু করে। কোনও কোনও শিল্পের ক্ষেত্রে তারা এত বেশী উন্নতি করেছিল যে, আর কোথাও তার তুলনা মিলত না। এইসব জিনিস তারা বিদেশে চালান দিত। এইভাবে মধ্যযুগের শেষ দিকে ইওরোপে একটি ছোট-খাটো শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়।

শিল্পোন্নয়নের প্রভাব

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং নতুন নতুন শহরের উদ্ভবের ফলে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসে। তাই দলে দলে গ্রামের লোক শহরে এসে ভিড় জমাতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভূমিদাস। তারা শহরে এসে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। শহরের লোকের কাঁচামাল ও খাদ্যের চাহিদা মেটাবার প্রয়োজনেই কৃষিকার্যের উন্নতি হয়েছিল। গ্রামের শিল্পী ও কারিগরেরা নিজেদের হাতে তৈরী জিনিসপত্র হাটেবাজারে নিজেরাই বিক্রি করত, তাদের লাভের অংশে আর কেউ ভাগ বসাতে পারত না। কিন্তু এই অবস্থা ক্রমে বদলে গেল। ধনী বণিকেরা তাদের অর্থের জোরে গ্রাম্য শিল্পী ও কারিগরদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বিদেশের বাজারে বেশী দামে বিক্রি করতে শুরু করল। তারা ক্রমে শিল্পী ও কারিগরদের মাইনে দিয়ে নানারকমের জিনিসপত্র তৈরীর কাজে নিযুক্ত করল। এইভাবে দেশের সর্বত্র ছোট ছোট কারখানা গড়ে ওঠে। তখন শহর ও গ্রামের ছোট ছোট স্বাধীন শিল্পী ও কারিগরেরা পরাধীন চাকুরীজীবি শ্রমিকে পরিণত হল। এইভাবে বাণিজ্যের সূত্রে একদল বণিক প্রচুর ধন ও বিত্তের অধিকারী হয়ে ওঠে। এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে গিয়ে বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইওরোপের নবজাগরণ

ভূমিকা

ইতিহাসের কোন ঘটনাই হঠাৎ ঘটে না। তার আগের যুগের ঘটনাস্রোতের মধ্যেই নিহিত থাকে তার আসল কারণ। এইভাবে প্রত্যেকটি যুগের বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তী যুগের ইতিহাসের গতিপথকে নির্দিষ্ট করে দেয়। যুগ যুগ ধরে এইভাবেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে ইতিহাসের ধারা। এই ভাবেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে মানুষের সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, তার ধর্মজীবনে। তাই ইতিহাসে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন ঘটল তা জানতে হলে ঠিক তার আগের যুগের ঘটেযাওয়া ঘটনাগুলিকে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

মধ্যযুগের ধ্যান ধারণা

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে ইওরোপের নবজাগরণ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইওরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই তখনকার লোকের জীবনের ওপর রোমান-ক্যাথলিক চার্চের কী অসীম প্রভাব ছিল। এই চার্চের ওপর প্রভুত্ব করতেন খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ। তাঁর আদেশ কেউই লঙ্ঘন করতে পারত না, এমন কি রাজারাও নয়। শিক্ষিত লোকের বেশীর ভাগই ছিলেন ধর্মযাজক। লেখাপড়ার ভারও ছিল তাঁদের ওপর। তাই খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়। মধ্যযুগের এইসব যাজক সাধারণ লোকেদের, কোন-রকম দ্বিরুক্তি না করে, অন্ধভাবে চার্চকে মান্য করতে শেখাতেন। তাছাড়া সংসারের সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তাদের পরলোকের চিন্তা করতে বলতেন। এই কারণে সমাজে তখন পরলোকের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগের ইচ্ছাকে পাপ বলে মনে করা হোত। কেউ যদি চার্চের বিরুদ্ধমত পোষণ করত তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হোত। এইভাবে ধর্মের প্রচণ্ড শাসন ও চিরা-চরিত প্রথার চাপে লোকে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল।

মধ্য ও বর্তমান যুগের সন্ধিক্ষণ

নবজাগরণের যুগে মধ্যযুগের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার ক্রমশঃ পরিবর্তন হচ্ছিল। সেইজন্য ঐতিহাসিকেরা এই যুগকে বর্তমান ও মধ্য-যুগের সন্ধিক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই পরি-বর্তনের সূচনা লক্ষ্য করা গেলেও ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের হাতে কন্-স্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের পর থেকে তা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। কারণ, কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল থেকে বহু গ্রীক পণ্ডিত তখন তাঁদের অমূল্য পুঁথিপত্রগুলি নিয়ে পশ্চিম ইওরোপে চলে আসেন এবং তারপর থেকেই সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

নবজাগরণের যুগ

এই সময়ে ইতালী প্রভৃতি দেশে একদল পণ্ডিত প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পাঠ করে দেখলেন যে, প্রাচীন যুগের এক মহৈশ্বর্য সেখানে লুকিয়ে আছে। তাঁরা দেখলেন যে, প্রায় হাজার বছর আগে এই প্রাচীন সভ্য জাতি দুটি শুধু ধর্মতত্ত্বই আলোচনা করত না, মানবজীবনের প্রয়োজনীয় আরও বহু তত্ত্বের তাঁরা আলোচনা করতেন। সেকালের দর্শন পড়ে তাঁরা জানলেন যে, তখনকার পণ্ডিতরা বিনা বিচারে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। সব কিছুই খুঁটিয়ে বিচার করে দেখতেন। স্বাভাবিকভাবে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগকেও তাঁরা পাপ বলে মনে করতেন না। কাজেই পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতগণ এসব থেকে স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা লাভ করলেন। প্রাচীন বিজ্ঞান পাঠ করে তাঁদের ধারণা হয়েছে কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যতীত প্রাকৃতিক জগতে কোন কিছুই ঘটতে পারে না। তাই কোন প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে ঈশ্বরের হাত আছে—একথা তাঁদের যুক্তিবাদী মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না। জীবনের বহু বিষয়ে তাঁদের অনু-সন্ধিৎসা জেগে উঠল এবং অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারগুলো উচ্ছেদ করবার জন্য তাঁরা সাহস সঞ্চয় করলেন। আর তাঁরা পরলোকের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে চাইলেন না। স্বাভাবিক, সুস্থ ও আনন্দময় জীবনযাপনের জন্যে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এইভাবেই অন্ধ সংস্কারের যুগের একদিন অবসান ঘটল। তখন ইওরোপের ইতিহাসে আর এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এ যুগের মানুষেরা অতীতের সংস্কার ও বাধাবন্ধন আর মানতে চাইল না। তারা আবিষ্কার করল নতুন ভাব, নতুন চিন্তাধারা। তাই ঐতিহাসিকেরা এই যুগের নাম দিয়েছেন রেনেসাঁস বা 'নবজাগরণের যুগ'।

রেনেসাঁসের প্রাণকেন্দ্র ইতালী

মধ্যযুগের শেষের দিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ছিল সভ্য নরনারীর কলকোলাহলে মুখর। এই অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইতালী। বিস্মৃত-প্রায় গ্রীক-রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষের গৌরব তখন তার সর্বাঙ্গে জড়িত। তাই রেনেসাঁসের প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ইতালীতে। এই সময়ে ইতালীতে কোন রাজনৈতিক একতা ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের মত সেখানে কতকগুলি স্বাধীন নগররাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধের সময় থেকে আরবদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে এরা খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এইসব শহরের লোকেরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিল। তাদের উৎসাহে ইতালীতে বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং সেখানে প্রাচীন যুগের বহু অমূল্য পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়। এইভাবে ধনী বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রেনে-সাঁসের নতুন চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ল ফ্লোরেন্স, মিলান, রোম, ভিনিস প্রভৃতি ইতালীর বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে।

রেনেসাঁসের বিস্তার

তারপর ইতালী থেকে এই নবজাগরণের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল ইওরোপের বিভিন্ন দেশে। রেনেসাঁসের এই নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে ইওরোপের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরা ছুটে আসতে লাগলেন ইতালীর বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে। এইভাবেই একদিন আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করে নবজাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল জার্মানীতে। সেখানে মধ্যযুগেই বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন ইতালীর পণ্ডিতেরা। তাঁদের বক্তৃতা শুনে জার্মান পণ্ডিতেরা পেলেন যেন নতুন পথের সন্ধান। নবজাগরণের ভাবধারার সঙ্গে আরও বেশি করে পরিচিত হবার জন্য তাঁরাও তখন বেরিয়ে পড়লেন ইতালীর বিভিন্ন নগররাষ্ট্র পরিক্রমায়। জার্মানীর কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী রাজা নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এবং দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য করে জার্মানীতে নবজাগরণের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রধানতঃ ইতালীয় অধ্যাপকদের বক্তৃতা এবং কিছু রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই জার্মানীতে নব-জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে সে দেশে নবজাগরণের শুরু অষ্টম চার্লসের নেপ্‌লস অভিযান থেকেই। তারপর প্রায় দুশো বছর ধরে ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তারই ফলে ফরাসী শিল্প-সাহিত্যে রেনেসাঁসের ছোঁয়া লাগে এবং

ক্রমে তা এক নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে। আর এ ব্যাপারে জার্মানীর মত ফরাসী রাজন্যবর্গের অবদানও বড় কম নয়। এইভাবে রেনেসাঁসের আলোড়ন ইতালীর সীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল জার্মানী, ফ্লান্ডার্স, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইওরোপের বিভিন্ন দেশে। সব দেশেরই কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পে যেন এক নতুন প্রাণস্পন্দনের ছোঁয়া লাগল।

সারা ইওরোপ জুড়ে নবজীবনের এই বিশাল আলোড়ন কিন্তু এক-দিনেই সম্ভব হয়নি। এর জন্যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। শীত শেষ হয়ে কখন যে পৃথিবীতে বসন্ত এসে যায় তা যেমন কেউ বুঝতে পারে না, ঠিক তেমনি করেই কখন যে মধ্যযুগ শেষ হয়ে রেনেসাঁসের যুগ শুরু হয়েছিল তারও কোন নির্দিষ্ট সীমা কেউ বলে দিতে পারেন না। তবে মধ্যযুগের শেষের দিকেই আমরা ইওরোপীয় জীবনে এই পরিবর্তনের আভাস দেখতে পাই। মধ্যযুগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের মনোজগতে নতুন নতুন প্রশ্নের আলোড়ন চলছিল। বলা যেতে পারে সেই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যেই রেনে-সাঁসের বীজ নিহিত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নব বোধোদয় বা মানবতাবাদ

ইওরোপে যারা নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের বলা হয় হিউ-ম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী। মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা শুধু পরলোকের চিন্তা আর ধর্মচিন্তাই করে গিয়েছেন। কিন্তু মানুষের জীবনের যে একটা বাস্তব দিক আছে, সংসারে বেঁচে থাকতে হলে তাকে যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—এসব কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নি তাঁরা। কিন্তু নতুন যুগের পথিকৃত যাঁরা তাঁরা সকলেই ছিলেন মানব-দরদী। তাই মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধান করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে তাঁরা ছিলেন সদা সচেষ্ট। মানুষের এইরকম মঙ্গলচিন্তাকেই বলে মানবতাবাদ।

মানুষের এই ধরনের মঙ্গলচিন্তার কথা ইওরোপের পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য পাঠ করে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা পড়তে পারে কজন লোক? তাই এই নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইওরোপের বিভিন্ন

দেশের পণ্ডিতেরা তখন নিজের নিজের মাতৃভাষায় সেইসব প্রাচীন পুঁথির অনুবাদ করতে শুরু করে দিলেন। এর ফলে ইওরোপীয় ভাষাগুলির দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। এইভাবে ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষার প্রসার আর সেই সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার মধ্যযুগের মৃতপ্রায় জীবনে এক প্রবল স্পন্দন জাগিয়ে তুলল।

পেত্রার্ক

ইতালীর ঐরকম একজন মানবতাবাদী কবি ও সাহিত্যিকের নাম পেত্রার্ক। প্রাচীন সাহিত্য চর্চায় তাঁর যেমন আনন্দ, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও ছিল তাঁর তেমনি উৎসাহ। ইতালীতে নবজীবনের বার্তা তিনিই প্রথম বয়ে এনেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও মানব জীবনের জয়গান—এই ছিল পেত্রার্কের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ইওরোপের বিভিন্ন ধর্মমন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে দেশবাসীর কাছে তার ভাবসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। ল্যাটিন ও ইতালীয় উভয় ভাষাতেই তিনি কবিতা লিখতেন। কবিতায় চতুর্দশপদী রীতি তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। মানুষের জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে তিনিই প্রথম চারণ কবিদের অনুকরণে গীতি কবিতা রচনা করেন। শুধু কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে নয়, একজন আদর্শ মানবতাবাদী পুরুষ হিসেবেও পেত্রার্কের সমকক্ষ সেযুগে আর কেউই ছিলেন না।

দান্তে

ইতালীর মহাকবি দান্তে ছিলেন নবযুগের আর এক পুরোধা। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'দি ডিভাইন কমেডিয়া'। মনুষ্যত্ব অর্জনই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং তা অর্জন করতে গেলে মানুষকে কোন্ পথ অবলম্বন করে চলতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন তিনি তাঁর ডিভাইন কমেডিয়া কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থের পাত্রপাত্রীরা সকলেই আমাদের কাছের মানুষ। তাদের চরিত্রের দোষত্রুটিগুলির কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি যাতে তারা তা শুধরে নিয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। দান্তে শুধু কবিই ছিলেন না, বাস্তব রাজনীতিবিদ্ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ল্যাটিন ভাষায় রচিত তাঁর 'মনার্কিয়া' গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন সেই শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই সভ্যতার বিকাশ

ঘটবে। তাই রাজনীতিবিদ্ হিসেবে তিনি চাইতেন পৃথিবীর সর্বত্র এক সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হোক যেখানে মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা অব্যাহত থাকতে পারে।

মেকিয়াভেলী

এই যুগে আর একজন বিখ্যাত লেখক ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম নিকোলা মেকিয়াভেলী। ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে তাঁর জন্ম। কূটনীতিবিদ্ হিসেবে মেকিয়াভেলীকে মৌর্যযুগের চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'দি প্রিন্স্'। সেই সময়ে ইতালী কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। জাতীয় ঐক্য বলে তখন কিছুই ছিল না। মেকিয়াভেলীর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, জাতীয় ঐক্য বিনা ইতালীবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনই পর্ণ হতে পারে না। সেইজন্যে তিনি ধর্মের অনুশাসন উপেক্ষা করে জাতীয় স্বার্থের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' হিসেবে মেকিয়াভেলীর নাম ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

বোকাশিও

সেযুগে ইতালীতে আর একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম বোকাশিও। তিনি ছিলেন পেত্রার্কের বন্ধু ও শিষ্য। তাঁর বিখ্যাত রচনা **'ডেকামেরণ'** অর্থাৎ একশটি গল্পের সঙ্কলন। কবি দশটি ছেলেমেয়ের মুখ দিয়ে এই গল্পগুলি বলিয়েছেন। পরবর্তীকালে শেক্সপীয়রের মত প্রতিভাধর কবি ও নাট্যকারকেও এই গল্পগুলি প্রেরণা জুগিয়েছিল। আজও ডেকামেরণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকে। পেত্রার্কের মত বোকাশিও-ও দেশবাসীর কাছে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের গৌরব প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর রচনা প্রাচীন ইতালীর গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁকে ইতালীর 'গদ্যসাহিত্যের জনক' বলা যেতে পারে।

স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন

ইংলণ্ডের ফ্রান্সিস্ বেকন ছিলেন একাধারে বিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ ও আইনজ্ঞ। বেকন বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন যা থেকে আমরা তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় পাই। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলির ভাষা ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের জন্যে ইংরাজী সাহিত্যের

ইতিহাসে বেকন আজও অমর হয়ে আছেন। তাঁর লেখা *Advancement of Learning* এবং *Novum Organum scientianum* গ্রন্থ দুটি তদানীন্তন দার্শনিক জগতে প্রায় যুগান্তর এনে দিয়েছিল বলা চলে।

চসার

মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যে চসারের স্থান সবার ওপরে। কর্ম-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'দি ক্যান্টারবেরি টেলস্'ই তাঁর কাব্য প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ইংলণ্ডের প্রধান ধর্মপীঠ ক্যান্টারবেরীর তীর্থযাত্রীরা তাঁর সরস অতুলনীয় বর্ণনাগুণে আজও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যুগের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের গণ্ডি পার হয়ে সহানুভূতি ও সরস কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে সে যুগের ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের দোষত্রুটি তিনি সুন্দরভাবে মেলে ধরেছেন এই বইয়ের মধ্যে। তাঁর আগের যুগের লেখকদের লেখা অবাস্তব কাহিনীর পরিবর্তে রক্তমাংসের মানুষগুলিকে তিনি যে স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব দান করেছেন তা নিঃসন্দেহে চসারের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

এডমণ্ড স্পেন্সর

ইংলণ্ডের নবজাগরণের আর এক পথিকৃৎ হলেন কবি এডমণ্ড স্পেন্সর। তিনি ইংরাজী ও ল্যাটিন উভয় ভাষাতেই কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'দি সেফার্ডস্ ক্যালেণ্ডার' এবং 'দি ফেয়ারি কুইন' সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য পাঠ করে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনায় প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি একদিকে যেমন সাধারণ মেষপালকের জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি আবার অন্য-দিকে রূপক চরিত্রের মাধ্যমে সেযুগের নাম-করা লোকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করে স্পেন্সরও উপলব্ধি করেছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য। সেই সত্যটিকে তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে ইংরেজী সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন।

শেক্সপীয়র

ইংরেজী সাহিত্যকে প্রকৃত সমৃদ্ধি দান করেছিলেন মহাকবি শেক্স-পীয়র। তাঁর সময়কাল ছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ষোল বছর। এরমধ্যে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

শেক্সপীয়র নাট্যকার ও কবি। চরিত্র অঙ্কনের বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায় ও ভাষার লালিত্যে শেক্সপীয়র আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর রচিত ম্যাকবেথ, কিং লীয়র, ওথেলো, জুলিয়াস সীজর, মারচেন্ট অব ভিনিস প্রভৃতি নাটক বিশ্বসাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁর রচিত সনেটগুলিও কাব্যগুণে অনন্য। বিভিন্ন নাটক ও কাব্যের মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়র মানুষের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন।

শেক্সপীয়র

এরাসমাস

এরাসমাস ছিলেন নেদারল্যাণ্ডের একজন ধর্মযাজক। ১৪৬৬ সালে তিনি নেদারল্যাণ্ডের রটারডেম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে তিনি প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। তাই তিনি মানুষকে কোন মতবাদ, তা সে রাজনীতি বিষয়কই হোক আর ধর্মবিষয়কই হোক, গ্রহণ করার আগে তা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখার পরামর্শ দিয়ে গেছেন। তখন গীর্জায় যে বাইবেল পাঠ করা হোত তার মধ্যে বহু ভুল ছিল। এরাসমাস মূল গ্রীকভাষা থেকে বাইবেল অনুবাদ করে সেই ভুলগুলি মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা **'মারিয়া এনকোমিয়াম'** বইটি সেযুগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন রাজা, বিশপ, এমন কি পোপ পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সকলেরই কিছু না কিছু দোষত্রুটি আছে। এরাসমাসের রচনাবলী নবযুগের মানবতাবাদী ভাবধারার প্রসারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

সেরভন্তেজ্

সেরভন্তেজ্ ছিলেন নবজন্মের যুগে স্পেনের একজন নামকরা কথা-সাহিত্যিক। তাঁর লেখা 'ডন্ কুইক্সোট' আদি উপন্যাস হিসেবে আজও পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। এই উপন্যাসে সেরভন্তেজ্ হাস্যরসের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় নাইটদের বীরধর্মকে ব্যঙ্গ করেছেন। মানুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ছবি তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনার

মধ্যে। বলা যেতে পারে স্পেনের সাহিত্যে সেরভন্তেজই ছিলেন নবজন্মের পথিকৃৎ।

রহ্‌বেলা

ফরাসীদেশে নবযুগের পথিকৃৎ ছিলেন রহ্‌বেলা। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। তাই মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিবাদী মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের অন্তরে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধরেছিলেন। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যযুগীয় চার্চের অনাচারকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন মানবতার পূজারী। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগীয় সমাজের উন্নতি বিধান করে মানুষের যথার্থ কল্যাণসাধন করা।

চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

দা ভিঞ্চি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু শিল্প প্রতিভা তাঁর অন্যান্য কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। রোম ও ফ্লোরেন্সের বহু গীর্জা ও প্রাসাদ আজও তাঁর সে প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। 'মোনালিসা', 'দি ভার্জিন অব দি রক্স', 'দি লাস্ট সাপার' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ চিত্র। তাঁর আঁকা ছবিগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে অঙ্কনশৈলী পর্যন্ত সব কিছুতেই নবযুগের ছাপ সুস্পষ্ট।
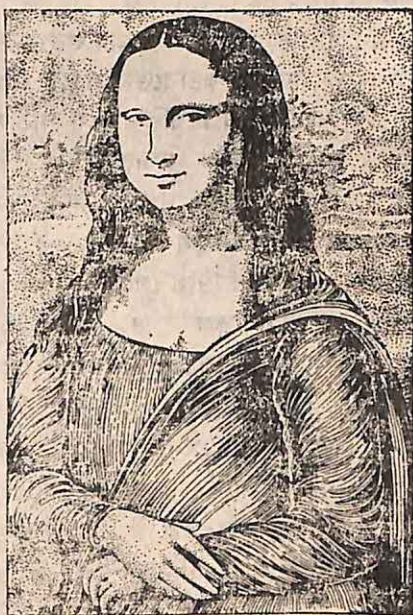
মোনালিসা

রাফায়েল

নবজাগরণের যুগে চিত্রশিল্পী হিসেবে অনেকে রাফায়েলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করে থাকেন। তিনি মানবদেহের সৌন্দর্য এমন নিখুঁতভাবে

এ কেছেন বোধহয় আর কোনও শিল্পী তেমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে 'ম্যাডোনা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মাতৃত্বের এমন

ম্যাডোনা

শান্ত, সুন্দর ও স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি সত্যিই দুর্লভ। মধ্যযুগের শিল্পীরা ছবির মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলার কোন চেষ্টাই করেননি। সেদিক থেকে অঙ্কনশিল্পের ক্ষেত্রে রাফায়েলকে নবযুগের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

মাইকেল এঞ্জেলো

স্থাপত্যশিল্পের দিক দিয়ে মধ্যযুগকে বলা যেতে পারে 'গথিক' যুগ। মিলানের গীর্জা এই স্থাপত্যরীতির একটি সুন্দর নিদর্শন। নবজাগরণের যুগে স্থাপত্যশিল্পে এই 'গথিক' রীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্যে ইতালীয় শিল্পীরা ক্রমেই সচেষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষে তাঁরা এক নতুন স্থাপত্যরীতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন। মধ্যযুগের 'গথিক' প্রভাবমুক্ত স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেন্ট পিটার্স গীর্জা। শিল্পে নবযুগের উদ্‌গাতা খ্যাতনামা স্থপতি ও শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো এই গীর্জার বৃহৎ গম্বুজটি তৈরী করেছিলেন।

এছাড়া মাইকেল এঞ্জেলো পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মর্মর মূর্তি নির্মাণ করে গেছেন। চিত্রকর হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ হল সেন্ট পিটার গীর্জার অন্তর্বর্তী সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাদে আঁকা বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন

ইংরাজী প্রবন্ধ সাহিত্যে বেকনের নাম অবিস্মরণীয়। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে তিনি সেযুগের মানুষকে বহু নতুন নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি ইংলণ্ডের বিজ্ঞান জগতে নবযুগের সূচনা করেছিল।

সেযুগে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যা কিছু বলবার তা আরিস্তোতল ও মধ্যযুগের খ্রীষ্টান দার্শনিকরা সবই বলে গিয়েছেন। কিন্তু বেকনের যুক্তিবাদী মন তা কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না। তাই তিনিই প্রথম প্রচার করলেন যে, তাঁদের কথাই শেষ কথা নয়। তিনি বললেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। প্রাকৃতিক নিয়ম ও পদার্থের গুণাগুণ একমাত্র পরীক্ষার দ্বারাই নির্ভুলভাবে জানা যেতে পারে। বলিষ্ঠভাবে এই কথা বলে বেকন বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে পরীক্ষিত সত্য যে অনেক বেশি খাঁটি—এই কথাই বেকন প্রচার করে গিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে। বেকনের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে নবযুগের সূচনা করেছিল বলা চলে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

দা ভিঞ্চি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর শিল্প প্রতিভার পরিচয় তোমরা আগেই পেয়েছ। এখন শোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কী অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা যখন ছিল মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর সেই যুগে তিনি একটি বিমানের নক্সা তৈরী করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি যেসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করে গিয়েছেন তা ছিল সে যুগের বিস্ময়ের বস্তু। তাই সেযুগের লোক তাঁকে যাদুকর আখ্যা দিয়েছিল। পূর্তবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। নদীর ওপর ব্রীজ তৈরীর কারিগরী কৌশল তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন সে যুগের মানুষকে। এইভাবে বিজ্ঞানকে মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে দা ভিঞ্চি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন।

রোজার বেকন

সে যুগে আর এক ইংরাজ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছিলেন। তাঁর নাম রোজার বেকন। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর মতে একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই মানুষ বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছতে পারে। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার মধ্যে ব্যবহারিক গণিতকেই তিনি সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করতেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল এই গাণিতিক প্রয়োগের দ্বারা বিজ্ঞানের সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তিনি কাচের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, কাচকে ধনুকের মত একটু বাঁকিয়ে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে দেখলে ছোট জিনিসকে অনেক বড় করে দেখা যায়। তাঁর পরীক্ষিত এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীন, চশমা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। বারুদের মধ্যে যে কী অসীম শক্তি নিহিত আছে তা তিনিই প্রথম পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। দা ভিঞ্চির মত রোজার বেকনও পরীক্ষা করে বুঝেছিলেন যে, মানুষের আকাশে ওড়ার যুগ আর বেশি দূরে নয়। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে জল কেটে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে স্টীমার ও জাহাজে পাখার মত একটা যন্ত্র লাগানো থাকে যাকে ইংরাজীতে বলে প্রপেলার। এই প্রপেলার যন্ত্রটিরও আবিষ্কর্তা ছিলেন রোজার বেকন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলেই নাবিকদের জলপথে ভূপ্রদক্ষিণ করে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও

মধ্যযুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। যাজকরাও একে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ কোপারনিকাস এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন সূর্য স্থির, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু চার্চের হাতে শাস্তির ভয়ে তিনি একথা প্রকাশ করতে সাহস করেননি। কোপারনিকাসের মৃত্যুর পর এই মহাসত্যটি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করেন ইতালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। দূরের জিনিসকে বড় করে দেখবার জন্যে 'দূরবীক্ষণ' নামে একরকম

কোপারনিকাস

যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন। এরই সাহায্যে তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। কিন্তু এই নতুন মতবাদকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলেন। গ্যালিলিওকে ধর্মদ্বেষী বলে ঘোষণা করা হোল। তাঁর মত ভুল—এই কথা স্বীকার করে তবে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তখনও মানুষের মন অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

গুটেনবার্গ

নবজাগরণের যুগের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার। জার্মানীর গুটেনবার্গ নামে এক ভদ্রলোক এর আবিষ্কর্তা। মধ্যযুগে বিদ্যালোচনার সুযোগ ছিল অতি সামান্য। তখন হাতে লিখে বই নকল করতে হোত এবং সেগুলি ছিল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে সেই সব বই যোগাড় করে পড়া সম্ভব হ'ত না। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিশ্রমে, কম খরচে এবং কম সময়ে বহু বই ছাপা হতে লাগল। ফলে দেশের লোকেরা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এইভাবে মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে মানবতাবাদের আদর্শ ও চিন্তাধারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এতবড় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ইওরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

মধ্যযুগে ইতালীর শহরগুলি আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আরব বণিকেরা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা এমন কি সুদূর চীন-জাপান থেকেও মণিমুক্তা, রেশম বস্ত্র, নানারকম সুগন্ধি ও সুখাদ্য মশলা সংগ্রহ করে ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলিতে নিয়ে আসত। ইতালীর বণিকেরা এগুলি কিনে ইওরোপের অন্যান্য দেশে খুব চড়া দামে বিক্রী করে অনেক লাভ করত।

প্রাচীন জাহাজ

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতনের পর ইওরোপ থেকে নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতে যাতায়াতের একমাত্র পথটি চলে গেল তুর্কিদের দখলে। তখন কোন ইওরোপীয় বণিকেরই প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার আর কোন উপায় রইল না। ফলে পশ্চিমা বণিকদের এতদিনের ফলাও কারবার বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল, আর সেই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌তে লাগল। এদিকে পশ্চিম ইওরোপের নাবিকেরা অনেকদিন ধরে নতুন কোন পথে প্রাচ্যের দেশগুলিতে যাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিল।

ইতিমধ্যে পশ্চিম ইওরোপে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। এই নবজাগরণ মানুষের মনে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। সেই নতুন চিন্তাধারায় উদ্দীপিত হয়ে মানুষ জানতে পেরেছে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং আবিষ্কার করেছে বহু যন্ত্রপাতি। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র আর উচ্চতামাপক যন্ত্র মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান-বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কারের আগে মানুষ অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাতে সাহস করত না, পাছে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে আর

উত্তর
আমেরিকা
আটলান্টিক
মহাসাগর
ইউরোপ
এশিয়া
প্রশান্ত
মহাসাগর
কলম্বাস (১৪৯২)
আফ্রিকা
ভাস্কো-দা-গামা
ভারত
মহাসাগর
প্রশান্ত
মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া
ম্যাগেলান
ম্যাগেলান
ইংল্যাণ্ড
স্পেন
পর্তুগাল
নেদারল্যাণ্ড
সামুদ্রিক আবিষ্কারের পথ
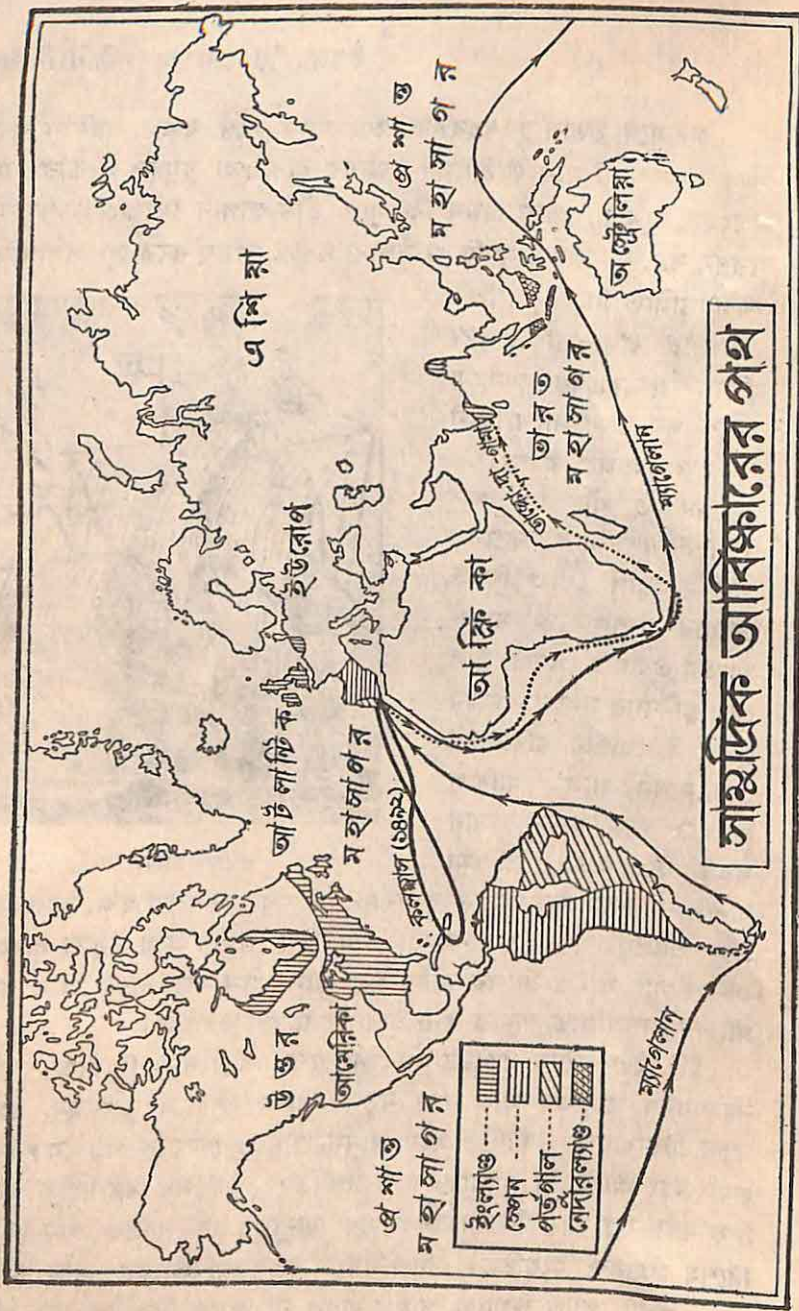
ফিরে আসতে না পারে। কিন্তু এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অসীম সমুদ্রে মানুষের পথ হারিয়ে যাবার ভয় আর রইল না। তাছাড়া নব-জাগরণের যুগে ইওরোপের অধিবাসীদের মনে যে সাহস, উৎসাহ ও কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল তা ক্রমেই তাদের নতুন নতুন অভিযানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল।

আগেই বলেছি প্রাচ্য দেশে যাবার একমাত্র পথটি তুর্কিরা দখল করে নেওয়ায় ইওরোপীয় বণিকদের ব্যবসায়ে তখন ভাঁটা চলছিল। দেশের অর্থনীতিকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই মন্দাভাব কাটিয়ে তুলতেই হবে। এর জন্যে প্রয়োজন নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার আর সেই সঙ্গে বিকল্প কোন জলপথ খুঁজে বার করা যেখান দিয়ে প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে তারা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। বলা যেতে পারে প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই পর্তুগাল ও স্পেনের দুঃসাহসী নাবিকেরা দলে দলে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অকূল সমুদ্রে।

প্রিন্স হেনরী

পর্তুগালের রাজপুত্র হেন্‌রী ছিলেন সেযুগে সামুদ্রিক অভিযানের একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগীজ নাবিকেরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেকখানি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। দক্ষ কারিগর নিযুক্ত করে তিনি উন্নত ধরনের জাহাজ নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল সেই জাহাজে চড়ে তিনি একদিন সুদূর প্রাচ্যের মসলা দ্বীপে অভিযান করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সে সাধ অপূর্ণই থেকে গেল।

দিয়াজ

বার্থোলোমিউ দিয়াজ

বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এখানে তাঁকে বিপদ্‌-সঙ্কুল ঝড়তুফানের মধ্যে পড়তে হয়েছিল বলে তিনি আফ্রিকার এই শেষ প্রান্তের নাম দেন 'ঝড়ের অন্তরীপ'। কিন্তু পর্তুগালের রাজা এই নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ', কেননা এতদিনে প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছানো যাবে বলে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

ভাস্কো-দা-গামা

এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে ভাস্কো-দা-গামা নামে আর একজন অসম সাহসিক পর্তুগীজ নাবিক ছোট ছোট চারখানা জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। জাঞ্জিবারের কাছে এসে তিনি সরাসরি সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হলেন (১৪৯৮)। এই-ভাবে এতকালের চেষ্টার পর জলপথে ভারতবর্ষে আসবার পথ খুঁজে পাওয়া গেল। তখন থেকে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে কুঠি স্থাপন করে রীতিমত একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিল।

ভাস্কো-দা-গামা

অ'লবুকার্কে

ভাস্কো-দা-গামার আবিষ্কৃত পথ ধরে আর এক পর্তুগীজ ভারত-বর্ষে এসেছিলেন ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে। নাম তাঁর অ'লবুকার্কে। নৌ-বিভাগীয় কার্যে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে পর্তুগীজ ভারতের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। তিনি গোয়া, সিংহল, মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ এবং পারস্য উপসাগরের মুখে অবস্থিত ওরমুজ বন্দর জয় করেন। তাই বলা যেতে পারে তাঁরই চেষ্টায় পর্তুগীজরা পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রাচ্যে গোয়া ছিল পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের রাজধানী।

কাব্রাল

ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দেখে ভাস্কো-দা-গামার চোখ ধেঁধে গিয়েছিল। তাঁর মুখে ভারতের ঐশ্বর্যের বর্ণনা শুনে পর্তুগালের রাজা পরের বছর কাব্রাল নামে এক নাবিককে পাঠালেন ভারতবর্ষ অভিযানে। তিনি ভাস্কো-দা-গামার আবিষ্কৃত পথে এগোতে থাকেন। কিন্তু আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পৌঁছবার পর প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝায় তিনি বিপথগামী হয়ে পড়েন। তাঁর নৌবহর এসে ঠেকলো দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে। এইভাবে ঘটনাচক্রে ব্রাজিলের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। ফলে আমেরিকা মহাদেশেও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে।

কলম্বাস

ভাস্কো-দা-গামার সময়ে ইতালীর জেনোয়া শহরে কলম্বাস নামে একজন নাবিক বাস করতেন। তাঁর ধারণা ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পার হলেই ভারতবর্ষে পৌঁছোনো যাবে। এদেশে আসবার জন্যে কলম্বাস পর্তুগালের রাজার কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সেখানে বিফল-মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি স্পেনে এসে রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলার কাছে তাঁর আবেদন জানান। ইসাবেলার আদেশে তিনখানি ছোট জাহাজ ও একশ' জন সঙ্গী দিয়ে কলম্বাসকে সাহায্য করা হ'ল। এর পর আট-লান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে একাত্তর দিন পরে তিনি স্থল দেখতে পান। ১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর আমেরিকার বিশাল মহাদেশটির অস্তিত্ব ইওরোপবাসীদের কাছে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কলম্বাস নিজে কিন্তু তা বুঝতে পারেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভারতের উপকূলেই এসে পৌঁছেছেন। এইজন্য প্রথমে তিনি যে দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই দ্বীপটি ও তার আশপাশের দ্বীপ-

কলম্বাস

গুলির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইণ্ডিজ' আর সেখানকার অধিবাসীদের বলা হোত 'ইণ্ডিয়ান'। এখনও এই দ্বীপগুলিকে 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' বলা হয়। এর পরে আমেরিকার কাছাকাছি আরও কয়েকটি দ্বীপ কলম্বাস আবিষ্কার করলেন, কিন্তু আসল মহাদেশটির সন্ধান তিনি পেলেন না। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই **আমেরিগো ভেসপুচি** নামে ফ্লোরেন্সের একজন অধিবাসী স্পেনের মহানাবিকের পদ লাভ করেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করে একটি বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে ঐ বিশাল মহাদেশটির নাম হয় আমেরিকা।

বালবোয়া

নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার এবং জয় করার উদ্দেশ্যে আর একজন দুঃসাহসী স্পেনীয় নাবিক আটলান্টিক সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন ১৫০১ সালে। তাঁর নাম **বালবোয়া**। তোমরা ভূগোলে পড়েছ পানামা খাল কেটে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরকে যোগ করা হয়েছে। এখন যেখানে পানামা খাল আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে তার আশপাশে আছে

কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ। বালবোয়া জাহাজ নিয়ে সেখানকার একটি দ্বীপে এসে হাজির হলেন। জায়গাটা পাহাড়ী অঞ্চল। সেখানেই তিনি প্রথম শুনলেন যে, ঐ পাহাড়ের অপর পারে আছে বিশাল এক সমুদ্র। বালবোয়ার আগে ইওরোপের আর কেউই জানতো না সেই বিশাল সমুদ্রের অস্তিত্বের কথা। পাহাড়ে উঠে তিনিই প্রথম দেখলেন সেই সমুদ্র। তাই প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কর্তা হিসেবে বালবোয়া আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। তোমরা জান দক্ষিণ আমেরিকার পেরু স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। বালবোয়া সেই পেরু অভিযানে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির জন্যে তাঁর পক্ষে পেরু পৌঁছানো সম্ভব না হলেও মুক্তা দ্বীপে পৌঁছে তিনি সেখান থেকে বহু মণিমাণিক্য নিয়ে এসেছিলেন।

মাজেলান

মাজেলান নামে আর একজন পর্তুগীজ নাবিক স্পেনের অধীনে চাকুরী করতেন। পাঁচখানি জাহাজ সঙ্গে করে তিনি মশলাদ্বীপের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তিনি প্রথম ব্রাজিলে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। প্রশান্ত মহাসাগর নাম তাঁরই দেওয়া। অনেকদিন পরে তিনি ফিলিপাইন দ্বীপে এসে পৌঁছলেন। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে একটি যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর অনেক সহযাত্রীর মৃত্যু হয়। মাজেলানের বাকী সঙ্গীদের কয়েকজন ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা ঘুরে তিন বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। এরাই সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। পৃথিবী যে সত্য সত্যই গোল এবং কলম্বাস যে একটা নতুন মহাদেশের সন্ধান পেয়েছিলেন, মাজেলান ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর দুঃসাহসিক অভিযান থেকেই তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হোল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল

বিভিন্ন নাবিকের দলে দলে সমুদ্র অভিযানের ফলে ইওরোপের মানুষদের ভৌগোলিক জ্ঞানের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটতে থাকে। নবজাগরণের আগে পর্যন্ত ইওরোপের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং সমুদ্রবেষ্টিত। কালক্রমে কম্পাসের ব্যবহার, সামুদ্রিক মানচিত্র, আবহাওয়ার হিসাব এবং নিরক্ষবৃত্ত সম্বন্ধে জ্ঞান এই অজ্ঞাত পৃথিবীর বহু গোপন রহস্য মানুষের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিল। লোকে জানল, পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়, এটা গোলাকার।

আমরা দেখেছি সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ইওরোপের মানুষ এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছে। সেখানকার পেরু, মেক্সিকো, ব্রাজিল প্রভৃতি অঞ্চলে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পেরু এবং মেক্সিকোতে বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মায়া ও আজ্‌তেক জাতির হাতে মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এই সমুদ্র অভিযানের ফলেই নব আবিষ্কৃত মহাদেশে সুপ্রাচীন এক মানব-সভ্যতার সঙ্গে ইওরোপবাসীর প্রথম পরিচয় ঘটে। তাছাড়া সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণ করে ইওরোপের দুঃসাহসী নাবিকেরাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

পর্তুগাল ও স্পেন তাদের আবিষ্কৃত দেশগুলিতে একচেটিয়া ব্যবসা করবার অধিকার দাবি করত। এতে তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। তখনও পর্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীর ওপর একটি কাল্পনিক রেখা টেনে দেওয়া হোল। এর পূর্ব অংশে পর্তুগীজরা আর পশ্চিম অংশে স্পেনবাসীরা একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করল। পর্তুগীজরা ক্রমে আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কুঠি স্থাপন করে এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ইতিমধ্যে কোর্তেজ নামে একজন যোদ্ধা মেক্সিকো জয় করে সেখানে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করেন। পিজারো নামে আর একজন যোদ্ধা পেরুতেও স্পেনের অধিকার স্থাপন করেছিলেন। আমেরিকার ধনরত্ন আহরণ করে এবং সেখানকার রূপার খনিগুলি অধিকার করে স্পেনের অধিবাসীরা এই সময়ে ইওরোপে খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

স্পেন ও পর্তুগালের ঐশ্বর্য দেখে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজেরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। তারাও তখন নিজেদের বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে জাহাজ পাঠাতে শুরু করল। ক্রমে তারাও এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থান অধিকার করে সেখানে নিজেদের বাণিজ্যঘাঁটি স্থাপন করে। এইভাবে পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হ'ল প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে। অতঃপর সেই সব দেশের সম্পদ শোষণ করে তারা ক্রমেই স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে তখন ইতালীর শহরগুলির গুরুত্ব কমে যায়। তাদের স্থান অধিকার করে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলস্থ দেশগুলি।

আমরা দেখেছি মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা চালু হবার পর থেকে বড় বড় জমিদারেরাই হয়ে উঠেছিলেন দেশের মধ্যে সর্বশক্তিমান। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চিম ইওরোপের রাজারাই লাভবান হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। কারণ বিদেশে ব্যবসা করবার অধিকার একমাত্র রাজারাই দিতে পারতেন আর সেই অধিকার প্রদানের বিনিময়ে রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমা পড়তে থাকে। ইওরোপের রাজারা তখন জমিদারদের চেয়ে অনেক বেশি ধনী হয়ে উঠলেন। অর্থবলে বলীয়ান রাজাদের সঙ্গে জমিদারেরা আর এঁটে উঠতে পারলেন না। সুতরাং রাজ্যের মধ্যে রাজারাই এখন হয়ে উঠলেন সর্বশক্তিমান। এই-ভাবে রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্য ফিরে আসে এবং রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের মনে জাতীয় চেতনাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হ'ল ইওরোপে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইওরোপের সংস্কার আন্দোলন

তোমরা আগেই পড়েছ নবজাগরণের ফলে ইতালীর লোকেরা বিদ্যা-চর্চা, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিতে অনুরাগী হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য আলোচনা করে তারা হারাণো যুগের মতই সহজ জীবন যাপন করবার পক্ষপাতী হয়ে পড়ে। তাদের মন কঠোর ধর্মজীবন ত্যাগ করে পার্থিব ভোগসুখের দিকে যেতে শুরু করে। কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর ইওরোপে নবজাগরণের ফল হ'ল অন্যরকম। হিব্রু ও গ্রীক ভ ষা চর্চার ফলে পোপের নেতৃত্বাধীন রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতিগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন তারা এই চার্চের অনুশাস.নর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে সমস্ত পশ্চিম ও উত্তর ইওরোপে 'ধর্ম সংস্কার' নামে এক বিশাল আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল।

এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কারণ হচ্ছে তখনকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধঃপতন। স্বয়ং পোপ থেকে শুরু করে সাধারণ ধর্মযাজক পর্যন্ত অনেকেই ধর্ম শিক্ষাদানের চেয়ে অর্থ সংগ্রহকে বড় বলে মনে করতেন। সাধুভাবে জীবনযাপনের পরিবর্তে তাঁরা বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন। তাঁদের জীবনে ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় না পেয়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের ওপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের খরচ মেটাবার জন্যে তাঁরা অশিক্ষিত জনসাধারণের ওপর নানা-রকম কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। পোপ নিজেই প্রচার করেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কাজেই কোন পাপী যদি তার পাপকার্যের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে পোপের ভাণ্ডারে অর্থদান করে, তবে তিনি তার সব পাপ মোচন করে স্বর্গে যাবার জন্যে একটি মুক্তিপত্র দান করবেন।

ওয়াইক্লিফ্

এইসব মিথ্যা সংস্কারের জাল অশিক্ষিত জনসাধারণকে অভিভূত করলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিন্তু তাতে ধরা দিলেন না। মধ্যযুগে ইংলণ্ডবাসী জন ওয়াইক্লিফ্ নামে একজন মনীষী যাজক সমাজের দুর্নীতি দূর করবার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অনুবাদ করেন। ওয়াইক্লিফ্ প্রচার করতে লাগলেন যে, যাঁরা ধর্মোপদেশ দেন তাঁদের পক্ষে ঐশ্বর্য সঞ্চয় ও উপভোগ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পোপের অর্থশোষণও অন্যায় বলে তিনি ঘোষণা করলেন। তাঁর এই প্রচারের ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের মনে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হতে লাগল। ওয়াইক্লিফের অনুগামী ধর্মোপদেষ্টারা 'দীন পুরোহিত'—এই নামে পরিচিত ছিলেন।

জন হাস্

সেকালের বোহেমিয়ায় অবস্থিত প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক জন হাস্‌ও ওয়াইক্লিফের মত ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অর্থ-গৃধ্নুতা এবং তাদের যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে-ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টানদের পরামর্শ দিতেন যীশুখ্রীষ্টের উপদেশগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে। এইভাবে ভগবান যীশুর নির্দেশিত পথে চলতে পারলেই মানুষের যথার্থ কল্যাণ হবে। জন হাস্ ওয়াইক্লিফের মতবাদকেই আবার নতুন করে প্রচার করে পরবর্তীকালে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি রচনা করে গিয়েছিলেন। তাই জন হাস্‌কে ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

মার্টিন লুথার

আগেই বলেছি অর্থের প্রয়োজন হলেই পোপ মুক্তিপত্র বিক্রয় করার কথা ঘোষণা করতেন। সেই ঘোষণা শুনে বহু পাপী-তাপী নিজেদের পাপস্খালনের উদ্দেশ্যে পোপের কাছ থেকে 'মুক্তিপত্র' ক্রয় করত। এই সময়ে রোমের সেন্ট পীটার্স গীর্জাটির নির্মাণ কার্য শেষ করবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পোপ মুক্তিপত্র বিক্রয় করবার কথা ঘোষণা করেন। তখন মার্টিন লুথার নামে জার্মানীর এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি সকলকে বোঝাতে লাগলেন যে, অনুতাপই হচ্ছে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, অর্থব্যয় করে পাপমোচন করা যায় না। তিনি আরও বললেন যে, ধর্মবিষয়ে সবাই স্বাধীন। বাইবেল পড়লেই ধর্মের মূল-কথা সব জানা যায়। তার জন্যে পোপের অধীনতা স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নেই। লুথারের কথা শুনে জার্মানীতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। লুথারের যুক্তিপূর্ণ উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই তাঁর

মার্টিন লুথার

প্রচারিত নতুন মতবাদ গ্রহণ করলেন। পোপ দশম লিও এবং সম্রাট পঞ্চম চার্লস অনেক চেষ্টা করেও এই মতবাদকে দমন করতে পারলেন না। এই সময়ে পবিত্র রোমের সাম্রাজ্যের (জার্মানীর) কয়েকজন প্রভাব-শালী রাজা লুথারের মতবাদ সমর্থন করেন। জার্মানী থেকে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ক্রমে উত্তর ইওরোপের ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুয়েডেন, নরওয়ে প্রভৃতি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মধ্যযুগের অখণ্ড খ্রীষ্টান জগৎ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীনপন্থীরা রয়ে গেলেন 'রোমান ক্যাথলিক', আর নবীনপন্থীরা 'প্রোটেস্টান্ট' বলে পরিচিত হলেন।

ইংলণ্ডের ধর্মসংস্কার আন্দোলন

মার্টিন লুথারের সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরী। যখন তিনি মার্টিন লুথারের ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধিতার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি পোপকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এই ধর্মবিরোধিতা তিনি সমূলে বিনাশ করতে চেষ্টা করবেন। এই কারণে পোপ তখন রাজা অষ্টম হেনরীকে 'ধর্মরক্ষক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু পরে ব্যক্তিগত কারণে পোপের সঙ্গে অষ্টম হেনরীর বিবাদ শুরু হলে তিনি তখন পোপের প্রাধান্য থেকে ইংলণ্ডের চার্চকে স্বাধীন করতে উদ্যোগী হলেন।

রাজা অষ্টম হেনরীর স্ত্রী ক্যাথরিণ ছিলেন স্পেনরাজের নিকট আত্মীয়া। ক্যাথরিণের কোন পুত্রসন্তান ছিল না বলে অষ্টম হেনরী তাঁকে ত্যাগ করে আর এক মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে পোপের কাছে অনুমতি চাইলেন। পোপ পড়লেন উভয় সঙ্কটে। বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিলে স্পেনরাজ অসন্তুষ্ট হবেন, আবার না দিলে অষ্টম হেনরী চটবেন। কিন্তু পোপ তখন এঁদের দুজনের কাউকেই চটাতে চাইলেন না। তাই তিনি হেনরীর আবেদন মঞ্জুর করতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু অষ্টম হেনরীর আর দেরী সহ্য হচ্ছিল না। তিনি তখন পোপের ওপর রেগে গিয়ে পার্লামেন্টের সাহায্যে ইংলণ্ডে পোপের ক্ষমতা খর্ব করেন। ১৫২৯ সালে রাজা ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সভা আহ্বান করলেন। পোপের সঙ্গে ইংলণ্ডের চার্চের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানই ছিল এই পার্লামেন্টের উদ্দেশ্য। তাই এই পার্লামেন্ট 'রিফরমেশন পার্লামেন্ট' নামে প্রসিদ্ধ। এই পার্লামেন্ট কতকগুলি আইন পাশ করে পোপের বদলে রাজাকেই ইংলণ্ডের চার্চের সর্বময় কর্তা হিসাবে স্বীকার করে নিল। এইভাবে হেনরী পোপের অধীনতা থেকে ইংলণ্ডের চার্চকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে নিয়েছিলেন। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে এখন ইংলণ্ডের রাজার

পোপের অনুমতি নেবার আর কোন প্রয়োজন রইল না। কারণ তিনিই তো এখন ইংলণ্ডের চার্চের কর্তা। বলা বাহুল্য তিনি পোপের অনুমতি ছাড়াই ক্যাথরিণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান মঠগুলিতে যাজকদের অধিকাংশই ছিল তখন পোপের অনুগামী। তাই রিফরমেশন পার্লামেন্ট একের পর এক আইন পাশ করে সেই সব যাজকদের ইংলণ্ডের চার্চের ওপর রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হ'ল। ইংলণ্ডের চার্চ থেকে বিভিন্ন

খাতে পোপ যে টাকা পেতেন সে টাকা অতঃপর রাজভাণ্ডারে জমা হতে থাকল। ধর্মব্যাপারে সমস্ত মামলা এখন থেকে রাজাই নিষ্পত্তি করবেন স্থির হ'ল। ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করে তা ইংলণ্ডের সমস্ত চার্চে পাঠ করার আদেশ দেওয়া হ'ল।

অষ্টম হেনরী নবজাগরণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যুবরাজ অবস্থায় কোলেট, ইরাসমাস প্রভৃতি মনীষীদের সান্নিধ্যে এসে তিনি ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এই প্রয়োজনের তাগিদে ইংলণ্ডে শুরু হয়নি। সেখানে শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে—অর্থাৎ রাজার বিবাহ বিচ্ছেদের তাগিদে। পোপের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে তিনি সেই জায়গায় নিজেকে স্থাপন করলেন। ইংলণ্ডের ধর্মাধিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেল। আসলে কিন্তু হেনরীর প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। এই কারণে ইংলণ্ডের ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে অনেকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলে মনে করে থাকেন। প্রায় এই একই সময়ে জন্ নক্স নামে একজন ধর্মসংস্কারক স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রচার করেছিলেন।

সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্ম বিষয়ে পোপের নির্দেশকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছিল। তাই তারা বিনা বিচারে পোপের আদেশ সব সময়েই শিরোধার্য করে নিত। এইভাবে খ্রীষ্টান জগতে পোপ হয়ে উঠেছিলেন সর্বশক্তিমান। প্রোটেস্টান্টরা ধর্মজগতে পোপের এই সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল। তারা বিশ্বাস করত ধর্মবিষয়ে মানুষের যা কিছু ইতিকর্তব্য তা সবই বাইবেলে লেখা আছে। সুতরাং মানুষ ধর্মাচরণ করবে বাইবেলের নির্দেশে, পোপের নির্দেশে নয়। এযাবৎ-কাল পোপের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ প্রোটেস্টান্ট মতবাদের মধ্যে যেন মুক্তির স্বাদ পেল। তাই এই মতবাদ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। মধ্যযুগে পোপের অধীনে সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ধর্মসংস্কার আন্দোলন সেই ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে খ্রীষ্টান জগৎকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল।

ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংস্কার

প্রোটেস্টান্ট ধর্মের দ্রুত প্রসার ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে পোপের অনুরাগী ক্যাথলিকেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তারা তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আত্মসমীক্ষা চালিয়ে নিজেদের দোষত্রুটিগুলি দূর

করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। সাধু চরিত্র এবং বিদ্বান হিসাবে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিরাই অতঃপর ক্যাথলিক চার্চের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হতে লাগলেন। ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি জন-সাধারণের মনে যাতে শ্রদ্ধার ভাব আবার ফিরে আসে সেই উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক যাজকদের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হোল।

মধ্যযুগে ধর্মগত অপরাধ তদন্তের জন্য ক্যাথলিক যাজকদের এক বিচার সভা ছিল। এর নাম ছিল ইন্‌কুইজিসন্ কোর্ট। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রসার রোধ করার উদ্দেশ্যে সেই বিচারসভাকে পোপ আবার কাজে লাগাতে শুরু করলেন। যারা ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী তাদের এই বিচারসভায় বিচার করে পুড়িয়ে মারা হত। কালক্রমে এই বিচারসভা ইওরোপের অনেক দেশেই ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এই অস্ত্র প্রয়োগ করেই পোপ ইতালী থেকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মূলোচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই সময়ে বিধর্মীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইগ্‌নেসিয়াস্ লয়োলা নামে এক খ্রীষ্টান সাধু একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেই প্রতিষ্ঠানটি জেসুইট সোসাইটি নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যেরা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উচ্ছেদকল্পে পোপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম বিশেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ক্যাথলিক ধর্ম দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে যেন কিছুটা স্থাণু হয়ে পড়েছিল। জেসুইটরা দেশবিদেশে ধর্মপ্রচার করে ক্যাথলিক ধর্মে গতি-শীলতা এনে দিয়েছিলেন। এই গতিশীলতাই সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ধর্মকে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছিল।

ইতালী ও জার্মানীর সীমান্তে ট্রেন্ট শহরে পোপ তৃতীয় পল ১৫৪৫ সালে এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। এই সভায় প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তাতে যোগদান করেনি। এই সভায় পোপকে খ্রীষ্টান জগতের সর্বময় কর্তা হিসেবে পুনরায় ঘোষণা করা হয় এবং যাজকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা যেন তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। এই সভার নির্দেশে পোপ একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। নিষিদ্ধ পুস্তক বলতে বোঝায় সেই সব বই যাতে ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী মতবাদকে সমর্থন করা হয়েছে। ক্যাথলিক যাজকদের পক্ষে সেই সব বই পাঠ করা দণ্ডনীয়

অপরাধ বলে গণ্য হোত। এই ধর্মসভার অধিবেশন মাঝে মাঝেই বসত এবং বলা যেতে পারে এই সভা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রসার রোধে এবং ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের তখন সম্রাট ছিলেন পঞ্চম চার্লস। তিনি ছিলেন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। তাই তিনি মার্টিন লুথার এবং তাঁর প্রোটেস্টান্ট মতবাদকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। জার্মানী তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সেই সব ছোট ছোট রাষ্ট্রের রাজাদের নিয়ে একটা আইনসভা গঠিত হয়েছিল। তার নাম ডায়েট। ১৫২১ সালে সেই আইনসভার অধিবেশনে মার্টিন লুথারকে ধর্মদ্রোহী এবং আইন-বহির্ভূত মানুষ হিসেবে ঘোষণা করা হ'ল। সম্রাট পঞ্চম চার্লস তখনই মার্টিন লুথার এবং তাঁর মতবাদকে সমূলে ধ্বংস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে তখনই সম্রাটের পক্ষে মার্টিন লুথারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে মার্টিন লুথারের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেছেন জার্মানীর বহু রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ। ১৫২৬ সালের ডায়েট অর্থাৎ আইনসভার অধিবেশনে দেখা গেল সেখানে উপস্থিত অনেক প্রতিনিধিই লুথারের সমর্থক। তাই প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উদ্ভবের ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেই সমস্যাকে আইনসভার প্রতিনিধিরা পাশ কাটিয়ে গেলেন। এই অধিবেশনে স্থির হ'ল বিভিন্ন দেশের রাজারা নিজের নিজের দেশের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৫২৯ সালে ডায়েটের অধিবেশনে আবার এই ধর্মীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে অনেকেই দাবি জানালেন যে, লুথার এবং প্রোটেস্টান্ট মতবাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এই কথা শোনামাত্র লুথারপন্থী রাজারা প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। তখন থেকেই লুথারপন্থীরা প্রতিবাদী অর্থাৎ প্রোটেস্টান্ট নামে পরিচিত হলেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত চার্চ প্রোটেস্টান্ট চার্চ নামে অভিহিত হ'ল।

১৫৪৬ সালে মার্টিন লুথার পরলোক গমন করেন। ইতিমধ্যে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের যুদ্ধের ঝামেলাও সব মিটে গেছে। তাই তিনি আবার নতুন করে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে জার্মানীর প্রোটেস্টান্ট রাজারা বাঁচার তাগিদে নিজেদের মধ্যে

একটা সংঘ গড়ে তুলেছেন। সেই প্রোটেস্টান্ট রাজাদের সংঘকে গায়ের জোরে ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে সম্রাট পঞ্চম চার্লস স্পেন থেকে জার্মানীতে সৈন্য নিয়ে এলেন। শুরু হয়ে গেল জার্মানীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ। অবশেষে ১৫৫৫ সালে অগ্‌স্‌বার্গ চুক্তিতে বিরোধের মীমাংসা হ্য়ে গেল। এই চুক্তিতে স্থির হ'ল জার্মানীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের রাজারাই ঠিক করে দেবেন ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম তাঁদের প্রজারা গ্রহণ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই চুক্তিতে রাজার ইচ্ছাকেই প্রজাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—প্রজাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতাকে আদৌ স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু তা না হলেও এই চুক্তি প্রোটেস্টান্ট ধর্মকে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছিল আর সেই সঙ্গে জার্মানীর সংস্কার আন্দোলনকে ধ্বংস করার যাবতীয় প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল এই অগ্‌স্‌বার্গ চুক্তি। আর এইটাই প্রোটেস্টান্ট ধর্মের সবচেয়ে বড় লাভ।

নেদারল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ উচ্ছেদকল্পে স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা

সম্রাট পঞ্চম চার্লেসের পুত্র স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন পিতার মতই গোঁড়া ক্যাথলিক। নেদারল্যাণ্ড রাজ্যটিও ছিল তখন স্পেনের অধীন। বর্তমান হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের উত্তরাংশের মোট সতেরটি প্রদেশ নিয়ে নেদারল্যাণ্ড রাজ্যটি গঠিত ছিল।

নেদারল্যাণ্ডে তখন সামান্য কয়েকজন প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও জার্মানীর ধর্মসংস্কার আন্দোলন তখনও সেদেশে কোন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দ্বিতীয় ফিলিপ প্রোটেস্টান্ট ধর্মকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডের সেই মুষ্টিমেয় প্রোটেস্টান্টদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে দিলেন। ফলে দেশের মধ্যে শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর সেই সঙ্গে লুঠতরাজ। হাঙ্গামাকারীদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্যে দ্বিতীয় ফিলিপ একজন দক্ষ সেনানায়ককে নেদারল্যাণ্ডের শাসনকর্তা করে পাঠালেন, আর তাঁর সঙ্গে দিলেন এক রণনিপুণ সেনাবাহিনী। বিধর্মী লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হ'ল এক বিচার সভা। হাজার হাজার লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হোল। বহু লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাল।

তারপর অন্যভাবে শুরু হ'ল প্রজাপীড়ন। নতুন শাসনকর্তা প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দিলেন অতিরিক্ত করের বোঝা। সেই করের চাপে

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। তখন নগরের অধিবাসী এবং দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। প্রজাদের সেই বিশেষ অধিকারগুলিও কেড়ে নেওয়া হোল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় ফিলিপের অত্যাচার শুধু প্রোটেস্টান্টদের ওপরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর স্বৈরাচারী নীতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তাই অনুরূপ পরিস্থিতিতে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ নগরবাসী সকলেই একত্র হয়ে দ্বিতীয় ফিলিপের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। নেদারল্যাণ্ডের এই বিদ্রোহের নেতৃত্বদান করতে এগিয়ে এলেন উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ। তিনি ছিলেন প্রোটেস্টান্ট। অত্যাচারী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে তিনি নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

দক্ষিণের দশটি প্রদেশের অধিবাসীরা ছিল প্রায় সকলেই ক্যাথলিক। তারা হঠাৎ এই বিদ্রোহ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় ফিলিপের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। এইভাবে দক্ষিণের দশটি প্রদেশের সমন্বয়ে যে ক্যাথলিক রাজ্যটি গড়ে উঠ্‌ল তার নাম বেলজিয়াম।

উত্তরের সাতটি প্রদেশের অধিবাসীরা ছিল প্রোটেস্টান্ট। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। স্পেনের সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনীর তুলনায় বিদ্রোহীরা হীনবল হলেও তারা কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। এই সংগ্রামে ইংলণ্ডের সমর্থন ছিল বিদ্রোহীদের প্রতি। তাই ইংলণ্ড অর্থ ও সৈন্য দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এতে ক্ষেপে গিয়ে দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর অজেয় নৌবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু স্পেনের সেই নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিল ইংলণ্ড। তবু একগুঁয়ে ফিলিপ কিছুতেই মেনে নিলেন না বিদ্রোহীদের স্বাধীনতা। অবশেষে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসানে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ করে। এইভাবে উত্তরের সাতটি প্রদেশের সমন্বয়ে যে স্বাধীন প্রোটেস্টান্ট প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হ'ল, তার নাম হল্যাণ্ড।

স্প্যানিস্ আর্মাডা

মেরি টিউডরের মৃত্যুর পর তাঁর ভগিনী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেরি টিউডর ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক

এবং তিনি বিয়ে করেছিলেন স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপকে। স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে তখন আর এক মেরি। তিনিও গোঁড়া ক্যাথলিক। রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মীয়তাও ছিল এবং সেই সূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসনের তিনিও একজন দাবিদার ছিলেন।

এলিজাবেথ যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সারা ইওরোপ জুড়ে। সেই আন্দোলনকে দমন করে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধেছেন স্বয়ং পোপ আর তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট এবং স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ। তাঁদের সকলের দৃষ্টি তখন ইংলণ্ডের দিকে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ছিলেন কূট রাজনীতিজ্ঞ। ইংলণ্ডে তখন যা অবস্থা তা দেখে তিনি ধর্মবিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। অর্থাৎ দেশের প্রোটেস্টান্ট বা ক্যাথলিক কোন সম্প্রদায়কেই তিনি চটাতে চাইলেন না।

ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরি নিজের দোষে প্রজাদের হাতে বন্দিনী হয়েছেন। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করা মাত্র রাণী এলিজাবেথ তাঁকে নজরবন্দী করে রাখলেন। তখন পোপ ও স্পেনরাজের বহু অনুচর এলিজাবেথকে হত্যা করে ও মেরিকে মুক্ত করে ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কিন্তু এলিজাবেথের কূটনৈতিক চালে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। এলিজাবেথের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরিও জড়িত আছেন সেই অপরাধে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এইসব চক্রান্তের পেছনে স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের যে এক বিরাট ভূমিকা আছে সে কথা বুঝতে রাণী এলিজাবেথের এতটুকু অসুবিধে হয়নি। তাই স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ হয়ে উঠলেন রাণী এলিজাবেথের দু'চক্ষের বিষ। স্পেনরাজকে বিব্রত ও হীনবল করার উদ্দেশ্যে রাণী এলিজাবেথ স্পেন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নেদারল্যাণ্ডবাসীদের অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

এছাড়া এলিজাবেথের ওপর স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের রাগের আরও কতকগুলি কারণ ঘটেছিল। সমুদ্রবক্ষে তখন বহু ইংরাজ নাবিক স্পেনের বাণিজ্যপোত আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ড্রেক নামে এক সাহসী ইংরাজ নাবিক অনেকবার আমেরিকায় গিয়ে স্পেনের অরক্ষিত বন্দর লুঠ করে ফিরে আসেন। আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলি ছিল ধনসম্পদে পূর্ণ। স্পেন সেই সব ধনসম্পদ জাহাজ

বোঝাই করে নিজেদের দেশে চালান দিত। ইংরাজ নাবিকেরা সেই সব মালবোঝাই স্পেনের জাহাজগুলিকে সমুদ্রপথে প্রায়ই লুঠ করত। এইসব জলদস্যুতার বিরুদ্ধে এলিজাবেথের কাছে বহুবার প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয়নি। কারণ আগেই পড়েছ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। তাই সব দিক দিয়ে স্পেনের স্বার্থ বিপন্ন হোক এটাই তিনি মনে মনে চাইতেন। এই কারণে স্পেনের জাহাজ লুঠের ব্যাপারে এলিজাবেথের পরোক্ষ সমর্থন ছিল ইংলণ্ডের জলদস্যুদের প্রতি। তাই স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের প্রতিবাদে তিনি কোন কর্ণপাতই করলেন না। উপরন্তু সেইসব ইংরাজ নাবিকদের রাজকীয় খেতাব প্রদান করে তাদের একাজে আরও উৎসাহিত করতে লাগলেন রাণী এলিজাবেথ।

ক্যাপ্টেন ড্রেক

অবশেষে স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভেঙ্গে পড়ল। ১৫৮৭ সালে স্পেনরাজ ইংলণ্ড আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু এই বছরেই ইংরাজ নাবিক ড্রেক কার্ভিজ বন্দরে স্পেনীয় নৌ-বহরের এক বিরাট অংশ বিধ্বস্ত করে দেন। কিন্তু ফিলিপ ছিলেন দুর্ধর্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। পরের বছরেই তিনি ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্যে আবার নতুন করে নৌবহর তৈরী করে নিলেন। ১৫৮৮ সালে মেডিনা সিডোনিয়ার নেতৃত্বে ১৩০ খানি রণতরী দ্বারা গঠিত স্পেনের অজেয় নৌ-বাহিনী ইংলণ্ড আক্রমণ করতে অগ্রসর হল। ফিলিপ আশা করেছিলেন ইংলণ্ডের ক্যাথলিকেরা তাঁর পক্ষে যোগ দেবে। কিন্তু ইংলণ্ডবাসীর কাছে ধর্মের চেয়ে দেশের স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি। তাই স্পেন আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্র নিজেদের ধর্মবিরোধ ভুলে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট নির্বিশেষে সমস্ত ইংরাজ আপন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। ইংরাজ সেনাপতি হাওয়ার্ডের অধীনে মাত্র ৭০ খানি যুদ্ধোপযোগী জাহাজ ছিল। এই সব জাহাজ পরিচালনা করেছিলেন ড্রেক, হকিন্স, ফ্রবিশারের মত সাহসী ও সুদক্ষ নাবিকেরা। তাছাড়া

স্পেনের বিশাল জাহাজের তুলনায় ইংরাজদের জাহাজগুলি ছিল অনেক হাল্কা, দ্রুতগামী এবং আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা অনেক বেশি সুরক্ষিত। সমুদ্রের ঝড়ে ভেঙ্গে না পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিল জাহাজগুলিকে। এইসব ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি আগ্নেয়পোতের আক্রমণে স্পেনের বিশাল মন্থরগতি যুদ্ধ জাহাজগুলি এঁটে উঠতে পারল না। চতুর ইংরাজদের আগ্নেয়পোতের আক্রমণে ক্যালের কাছে স্পেনের বিশাল নৌবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারপর উঠল সমুদ্রে প্রবল ঝড়। সেই ঝড়ের মুখে পড়ে সেনাপতি মেডিনা সিডোনিয়াকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে স্কটল্যাণ্ড ঘুরে দেশে ফিরতে হল। স্পেনের হাজার হাজার সৈন্য এবং বহু যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেল। পরাজিত স্প্যানিস নৌবহরের অবশিষ্ট মাত্র ৫৩ খানি জাহাজ স্পেনে ফিরে যেতে সমর্থ হয়েছিল। স্পেনের বিরাট নৌবাহিনীর পরাজয়ের ফলে একদিকে যেমন ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য প্রোটেস্টান্ট দেশের ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা পেল, অন্যদিকে তেমনি এই যুদ্ধ জয়ের ফলে ইংলণ্ডের নৌবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হ'ল। তাদের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য দিকে দিকে প্রসার লাভ করতে শুরু করল।

পঞ্চম অধ্যায়

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব

ভূমিকা

রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে টিউডর শাসনের অবসান হয়। নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে টিউডর যুগে ইংলণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার হতে থাকে। ফলে বণিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তখন সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা দেশ শাসনে অংশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করত। দীর্ঘকাল আন্দোলন ও সংগ্রামের পর তারা রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। এর ফলে শাসনব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছিল তাকেই ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়।

স্টুয়ার্ট রাজত্বের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের অবস্থা

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয় স্কটল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম জেম্‌স্ নামে পরিচিত হন। স্টুয়ার্ট রাজারা বিদেশী ছিলেন বলে প্রজাদের অভিপ্রায় বুঝে কাজ করতে পারতেন না। ইংলণ্ডবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তাঁদের বিশেষ কোন সহানুভূতি ছিল না। টিউডর রাজাদের মত তাঁদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ ছিল না, অথচ সেই সব রাজাদের মত তাঁরাও স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজত্ব করবার দাবি করতেন। এদিকে দেশের পার্লামেন্টে এই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা স্বেচ্ছাচারী স্টুয়ার্ট রাজশক্তিকে খর্ব করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল। ফলে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল।

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের কারণ

প্রথম জেম্‌স্ মনে করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তাঁর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ঈশ্বরের দান। সুতরাং তাঁর কাজের জন্য তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো কাছে দায়ী নন। প্রজাদের পক্ষে রাজকার্যের সমালোচনা করা দেবনিন্দার মতই গর্হিত কাজ বলে তাঁর ধারণা ছিল।

আবার বহুকাল থেকে পার্লামেন্ট কর ধার্য করবার ক্ষমতা দাবি করে আসছিল। কিন্তু জেম্‌স্ ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস পার্লামেন্টের বিনা

অনুমতিতেই প্রজাদের কাছ থেকে নানাভাবে কর আদায় করতেন। কোন লোক রাজার বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখা হ'ত। পার্লামেন্টে রাজকার্যের সমালোচনা হ'ত বলে তাঁরা অনেক সময়েই পার্লামেন্টকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতেন। এদিকে যখনই কোন কারণে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা হ'ত, তখনই সদস্যরা নানারকম শাসন-সংস্কারের দাবি করত। কিন্তু জেম্‌স্ বা চার্লস কেউই তাতে কর্ণপাত করতেন না। এই সব কারণে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

চার্লস

প্রজার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে আবেদন

প্রথম জেম্‌স্ যতবারই পার্লামেন্ট আহ্বান করেছিলেন, ততবারই তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতে তিনি অধিবেশন ভেঙ্গে দেন। প্রথম চার্লসও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। শেষে বে-আইনী উপায়েও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস তৃতীয়বার পার্লামেন্ট ডাকেন। কিন্তু সদস্যরা অর্থ দেবার পরিবর্তে রাজার কাছে প্রজার ন্যায্য অধিকার সংক্রান্ত এক আবেদনপত্র দাখিল করলেন। এতে রাজাকে জানানো হোল যে, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কর বা ঋণ গ্রহণ, বিনা বিচারে কাউকে কারারুদ্ধ করা এবং শান্তির সময়ে সামরিক আইন জারী করা—এ সবই অবৈধ বলে পরিগণিত হবে। অর্থের প্রয়োজনে চার্লস এই শর্তগুলি মেনে নিতে রাজী হলেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। জোর করে পার্লমেন্টের অধিবেশন তিনি ভেঙ্গে দেন।

চার্লসের স্বেচ্ছাচার

এরপর চার্লস দীর্ঘ এগার বছর (১৬২৯—৪০) পার্লামেন্টের অধিবেশন না ডেকেই স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজ্যশাসন করে যেতে লাগলেন। নানারকম বে-আইনী উপায়ে অর্থ-সংগ্রহও চলতে লাগল। যারা তাঁর

বিরুদ্ধাচরণ করল তাদের কারারুদ্ধ করে রাখা হ'ল। ক্রমে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। তখন অর্থের অভাবে চার্লসকে আবার পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হতে হ'ল।

দীর্ঘ পার্লামেন্ট

নতুন পার্লামেন্ট কুড়ি বছর (১৬৪০—৬০) স্থায়ী হয়েছিল বলে ইতিহাসে এটি দীর্ঘ পার্লামেন্ট নামে বিখ্যাত। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সদস্যরা একযোগে প্রথমেই চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন। তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে দুজনের প্রাণদণ্ড হ'ল। রাজা যাতে আর স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজত্ব করতে না পারেন সেইজন্যে কতকগুলি নতুন ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে স্থির হয় যে, এরপর তিন বছর অন্তর রাজাকে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতেই হবে। কিছুদিন পরে কয়েকজন বড় বড় নেতা দাবি করলেন যে, রাজাকে কমন্স সভার বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হবে এবং প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থার কতকগুলি পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাব দুটি সকলের মনঃপূত না হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। চার্লস তখন পার্লামেন্টের পাঁচ জন চরমপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। এবার চরমপন্থী দল রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

গৃহযুদ্ধ

রাজার সঙ্গে বিদ্রোহীদের প্রায় সাত বছর (১৬৪২—৪৯) ধরে যুদ্ধ চলেছিল। প্রথমদিকে রাজারই জয় হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে পার্লামেন্টের পক্ষে একজন বীর সৈনিকের আবির্ভাব হ'ল। তাঁর নাম অলিভার ক্রমওয়েল। তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ছিল। এক নতুন সৈন্যদল গঠন করে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করলেন। রাজা চার্লস বন্দী হলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও চার্লস বিপক্ষ দলকে জব্দ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। তখন পার্লামেন্টের দলের লোকেরা আদালতে চার্লসের বিচার করে এবং বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ হয় (১৬৪৯)। মৃত্যুকালে চার্লস যথেষ্ট সাহস ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ক্রমওয়েলের দেশশাসন

চার্লসের মৃত্যুর পর রাজপদ তুলে দিয়ে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু আসলে ক্রমওয়েল হয়ে উঠেছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তিনিও পার্লামেন্টের ধার ধারতেন না। সেনাপতিদের সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করতেন। ক্রমওয়েল পিউরিটান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই তিনি কোনরকম আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করতেন না। এইজন্যে দেশের লোকেরা প্রাণ খুলে হাসি-তামাসায় যোগ দিতে সাহস করত না। ক্রমওয়েলের সময়ে ইংলণ্ডে পিউরিটান ধর্মের খুব প্রসার হয়েছিল। এই সময়ে বিদেশেও ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল।

ক্রমওয়েল

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর দু'বছর পরে (১৬৬০) প্রথম চার্লসের নির্বাসিত পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তখন আবার ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। পিতা ও পিতামহের মতই রাজার অধিকার সম্বন্ধে দ্বিতীয় চার্লসের উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতেন না। তাঁর পঁচিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে পার্লামেন্টের সঙ্গে তিনি মোটের ওপর সদ্ভাব রেখে চলেছিলেন।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ ও গৌরবময় বিপ্লব

দ্বিতীয় চার্লসের পর রাজা হন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্। তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। এইজন্যে দেশের আইন অমান্য করে তিনি ক্যাথলিকদের প্রতি নানারকম অনুগ্রহ দেখাতেন। এছাড়া তিনি প্রথম চার্লসের মত স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজত্ব চালাবার চেষ্টা করতে থাকেন। কাজেই রাজা ও প্রজার মধ্যে এই সময়ে আবার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠ্‌ল।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ বহুকাল অপুত্রক ছিলেন তাই প্রজারা আশা করেছিল, যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রোটেস্টান্ট কন্যা মেরি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে জেম্‌সের এক পুত্র হয়। তখন প্রজাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের ভয় হ'ল যে, জেম্‌স্ নবজাত শিশুকে

ক্যাথলিক ধর্মেই দীক্ষিত করবেন। এইজন্যে দেশের বড় বড় নেতারা তখন একত্র হয়ে মেরির স্বামী হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান করলেন। উইলিয়াম সসৈন্যে ইংলণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু জেম্স্ তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা না করেই ফরাসী দেশে পালিয়ে গেলেন। বিনা রক্তপাতে এই বিপ্লব হয়েছিল বলে একে 'গৌরবময় বিপ্লব' বলা হয়।

পার্লামেন্টের অধিকার সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা

উইলিয়াম ও মেরির সিংহাসনে আরোহণের পর পার্লামেন্ট 'বিল অব রাইটস' নামে একটি আইন পাশ করে রাজার ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছিল। এই আইনে স্থির হ'ল যে, এখন থেকে পার্লামেন্টের অধিবেশন ঘন ঘন বসবে এবং সদস্যরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারবেন। রাজা কারুর ক্ষেত্রেই কোন আইন বাতিল করতে বা আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারবেন না। পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া রাজা কোন কর স্থাপন করতে পারবেন না এবং শান্তির সময়ে কোন স্থায়ী সৈন্য রাখতে পারবেন না। হাই কমিশনের বিচারালয় এবং ঐ ধরনের যাবতীয় বিচারালয় সম্পূর্ণ বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হ'ল। প্রজা-মাত্রেরই রাজার কাছে অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে আবেদন করবার অধিকার থাকবে। অতঃপর ইংলণ্ডের সিংহাসনে কোন ক্যাথলিক ধর্মা-বলম্বীকে বসতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হ'ল।

এই আইনের ফলে পার্লামেন্টের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্যশাসন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এককথায় দ্বিতীয় জেমসের আমলে যেসব বে-আইনী স্বৈরাচারী কাজকর্ম হয়েছিল সেগুলির যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বিল অব্ রাইটস্-এর শর্তগুলি রচিত হয়েছিল।

পরে অপর একটি আইন পাশ করে প্রতি তিন বছর অন্তর পার্লামেন্টের নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই আইনের ফলে তিন বছরের বেশি পার্লামেন্টের নির্বাচন বন্ধ করে রাখা আর সম্ভব হ'ল না। আর একটি আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল।

অন্যান্য ফলাফল

আগে স্টুয়ার্ট রাজারা সবাই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি-নিধি। তাই একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর কাছেই তাঁরা তাঁদের

কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে চাইতেন না। কিন্তু গৌরবময় বিপ্লব রাজাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করল। এই বিপ্লব প্রজাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির কাছে রাজাকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেছিল। ফলে রাজার ক্ষমতা গেল কমে। তখন থেকে ইংলণ্ডের রাজারা রাজত্ব করছেন বটে, কিন্তু দেশ শাসনের চাবিকাঠিটি রয়ে গেছে পার্লামেন্টের হাতে। এইভাবে রাজা ও পার্লামেন্টের জয় সূচিত হল। রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লোপ করে এই বিপ্লব দেশের আইন রাজার উর্ধ্বে —এই নীতিই প্রমাণ করেছিল।

এই বিপ্লবের ফলে ক্যাথলিক ধর্মমতের ওপর প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। স্টুয়ার্ট রাজাদের ক্যাথলিক ধর্মমত সমর্থন করার ফলে রাজার সঙ্গে ইংরাজ জাতির অধিকাংশের যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল ১৬৮৮ সালের বিপ্লব সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের জয় সূচিত করে দিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুঘল শাসনে ভারত

ইওরোপে যখন নবজাগরণ এবং ধর্ম আন্দোলনের প্লাবন বয়ে চলেছে ভারতবর্ষ তখন মুঘল বাদশাহদের শাসনাধীন। তাঁরা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহামতি আকবর। কারণ তিনিই এর ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করেছিলেন।

ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা

আকবরের পিতামহ বাবরই সর্বপ্রথম ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মধ্য এশিয়ায় বাস করতেন। বাবরের পিতা ছিলেন দুর্ধর্ষ তৈমুরলঙের বংশধর এবং তাঁর মাতা ছিলেন মোঙ্গল বীর চেঙ্গীস খাঁর বংশজাত। মাত্র এগার বছর বয়সে বাবর তাঁর পিতৃ-রাজ্য মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ফরগনার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু জ্ঞাতিদের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি কাবুল অধিকার করে সেখানে

তৈমুর লঙ

বাবর

রাজত্ব করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁর ধনধান্যে ভরা হিন্দুস্থান জয় করবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে। অক্লান্তকর্মী বাবরের সে স্বপ্ন বিফল হয়নি। ১৫২৬ সালে পাণিপথের প্রান্তরে পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে তিনি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই সময়ে রাজপুতানার অন্তর্গত মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের হাতে তাঁরও পরাজয় ঘটে। এরপর পাটনার কাছে আরেকটি যুদ্ধে পূর্ব ভারতের আফগান দলপতিদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে বাবর উত্তরভারতে নিজের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এর চার বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বিজিত সাম্রাজ্যটিকে সুগঠিত করে যেতে পারেননি।

হুমায়ুন ও শেরশাহের দ্বন্দ্ব

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির পর গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ এবং বিহারের শের খাঁর সঙ্গে হুমায়ুনের বিরোধ বাধে। হুমায়ুনের হাতে বাহাদুর শাহের পরাজয় ঘটে। কিন্তু পূর্বভারতে শের খাঁ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে থাকেন। শের খাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন। শক্তি সঞ্চয় করে তিনি ঐ অঞ্চলের দুর্ভেদ্য চুণার ও রোটাস দুর্গ অধিকার করেন এবং ক্রমে বঙ্গদেশের অধিকাংশও তিনি জয় করে নেন। হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর দু'বার যুদ্ধ হয়েছিল। কনৌজের যুদ্ধে শের খাঁ হুমায়ুনকে দারুণভাবে পরাজিত করেন। রাজ্যহারা হুমায়ুন

হুমায়ুন

শের শাহ্

পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে পারস্যে চলে যান।

শের খাঁ তখন শের শাহ্ উপাধি নিয়ে হিন্দুস্থানের সম্রাট হলেন। মুঘলদের কাছ থেকে তিনি আগ্রা, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি জয় করেছিলেন। সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি মালব, রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ড জয়

করেন। এইভাবে তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের আধিপত্য লাভ করেছিলেন। শুধু বিখ্যাত যোদ্ধা হিসাবেই নয়, সদক্ষ শাসক হিসাবেও তিনি ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। পরবর্তী কালে মহামতি আকবর শের শাহের শাসননীতি অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন।

শের শাহ্ মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর বংশধরেরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে হুমায়ুন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নেন। ভারতে মুঘল রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু হুমায়ুন বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আকবর

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তের বছর বয়সে হুমায়ুনের পুত্র আকবর মুঘল সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়। শের শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মহম্মদ আদিল শাহ্। তাঁর এক হিন্দু সেনাপতি হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মুঘলদের হাত থেকে দিল্লী ও আগ্রা জয় করে নিয়েছিলেন। ফলে বিখ্যাত পাণিপথের প্রান্তরে (১৫৫৬) মুঘল-পাঠানে দ্বিতীয় বার ভাগ্য পরীক্ষা হ'ল। হিমু পরাজিত ও নিহত হলেন। এরপর পাঠানশক্তির পুনরুত্থানের আর কোন সম্ভাবনা রইল না।

আকবর

রাজ্যবিস্তার

পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পর আকবর সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। একে একে আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর সেনাপতিরা মালব এবং গণ্ডোয়ানা রাজ্যের কিছু অংশ জয় করলেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং বন্দী হবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন।

আকবর এবার রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট বুঝেছিলেন যে, দুর্ধর্ষ রাজপুতদের সহায়তা ব্যতীত মুঘল সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না। তাই তিনি রাজপুত কন্যা

বিবাহ করে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। অম্বরের রাজপুত্র মানসিংহ তাঁর সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু মেবারের স্বাধীনতাপ্রিয় রাণারা আকবরের অধীনতা মানতে চাইলেন না। কাজেই আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করে কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি অধিকার করে নিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে মানসিংহ ও আকবরের পুত্র সেলিমের হাতে রাণা প্রতাপ সিংহের পরাজয় ঘটে। কিন্তু এর পরেও দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এই বীর রাণা মেবার উদ্ধারের জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ মুঘল সেনার কাছে পরাজিত হলেও ইতিহাসে প্রতাপের বীরত্বের খ্যাতি আজও অম্লান হয়ে আছে।

আকবর ক্রমে পশ্চিমে গুজরাট থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তরভারত জয় করেন। কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, সিন্ধু-দেশ প্রভৃতিও একে একে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। বঙ্গবিজয়ের প্রায় পনের বছর পরে আকবর উড়িষ্যা জয় করেন।

উত্তর ভারত বিজয় সমাপ্ত হবার পর আকবর দক্ষিণ ভারতেও রাজ্যবিস্তার করতে চেষ্টা করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজারা এই সময়ে আত্মকলহে মত্ত ছিলেন। এই সুযোগে আকবর বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগরের কিছু অংশ জয় করে নিলেন। এইভাবে পারস্যের পূর্ব সীমান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও হিমালয় পর্বত থেকে গোদাবরী পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল।

আকবরের অপক্ষপাত শাসনে ভারত-বর্ষে জাতিধর্মের কলহ দূর হয়ে গিয়ে এক অখণ্ড জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর

আকবরের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তিনিও রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করে-ছিলেন। তাঁর শাসনকালে মানসিংহ প্রভৃতি মুঘল সেনাপতিরা বাংলাদেশ, মেবার ও আহম্মদনগর জয় সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু এই সময়ে পারস্য-সম্রাট মুঘলদের হাত থেকে কান্দাহার কেড়ে নেন।

শাহ্‌জাহান

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ্‌জাহান হিন্দুস্থানের সম্রাট হন। সিংহাসন লাভের পর তিনি রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেন এবং কান্দাহার ও মধ্য এশিয়ায় তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজধানী সমরখন্দ্‌ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা এই সময়ে মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল শিল্পোন্নতি, জাঁকজমক এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ, আর এই জন্যেই তাঁর শাসনকালকে মুঘল রাজত্বের 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়।

শাহ্‌জাহান

বৃদ্ধ বয়সে শাহ্‌জাহান কিন্তু অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বাধে। অবশেষে তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব অপর তিন ভাই দারা, সুজা ও মুরাদকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং পিতাকে বন্দী করে নিজে সম্রাট হন।

ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেব 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবরের মত তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে আসামের কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটিকেও তিনি সম্পূর্ণ রূপে জয় করেন। এরপর সুদূর তাঞ্জোর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

ঔরঙ্গজেব

মুঘলবিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান

ঔরঙ্গজেব শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর মত সাহসী ও রণকুশল সেনাপতিও খুব কম দেখা যায়। রাজ্যের সমস্ত কাজ তিনি নিজেই দেখাশুনা করতেন। কিন্তু ধর্মবিষয়ে ঔরঙ্গজেব ভয়ানক গোঁড়া ছিলেন। পবিত্র কোরাণের প্রত্যেকটি উপদেশ

তিনি মেনে চলতেন। পরধর্মের প্রতি উদারতা তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি হিন্দুদের দেব মন্দিরগুলি ধ্বংস করবার আদেশ দেন এবং তাদের ওপর আবার জিজিয়া কর প্রবর্তন করেন।

সম্রাটের এই রকম ধর্মান্ধতার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মুঘল-বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান হয়। মেবারের রাণা রাজসিংহ এবং রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের অধিনায়কত্বে রাজপুত জাতি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ফলে তাদের সহযোগিতা হারিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল।

পাঞ্জাবের শিখেরাও এই সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। আকবর শিখ ধর্মগুরুদের রীতিমত সম্মান করতেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময়ে শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুরকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তখন নবম গুরু গোবিন্দের অধীনে শিখেরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং ক্রমে তারা পাঞ্জাবে মুঘলদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ

এদিকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গেও মুঘলদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মারাঠাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন শিবাজী। কিশোর বয়সে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতীয় লোকদের নিয়ে একটা নিজস্ব সেনাদল গঠন করেন। এদের সাহায্যে তিনি ক্রমে বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিয়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গড়ে তুললেন। ফলে মুঘলদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। কয়েকটি যুদ্ধের পর ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু সম্রাট তাঁকে অপমান করে আগ্রাতে নজরবন্দী করে রাখেন। শিবাজী কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আবার দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর মারাঠাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মারাঠা রাজ্যের অধিকাংশ মুঘলদের হাতে চলে আসে। শিবাজীর পুত্র শাম্ভাজী যুদ্ধে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

শিবাজী

এরপর শিবাজীর আর এক পুত্র রাজারাম আর তাঁর স্ত্রী তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্বদান করতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব তাদের দমন করতে পারলেন না। মারাঠাদের দমন করতে গিয়েই ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ সালে আহম্মদনগর দুর্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে ঔরঙ্গজেব ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল মুঘল সাম্রাজ্যের যে বিস্তার

ঘটিয়েছিলেন, ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, তাঁর রাজত্বকালেই সেই বিশাল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়ে গেল।

মুঘল আমলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র

মুঘল যুগে বহু বৈদেশিক পর্যটক ভারত ভ্রমণে এসে বহু মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এইসব পর্যটকদের মধ্যে ফরাসীদেশের

তাভার্নিয়ে ও বার্ণিয়ে, ইংলণ্ডের স্যার টমাস রো এবং ইতালীর মানুচী ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে তাঁদের বিবরণ খুব নির্ভরযোগ্য না হলেও তাঁদের লেখা থেকে সেযুগের মোটামুটি একটা সমাজচিত্র কল্পনা করে নেওয়া যায়।

দিল্লী ও আগ্রা ছিল তখন ভারতের রাজধানী। সেখানকার বড় বড় অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ অসংখ্য লোকজনে পূর্ণ থাকত। সম্রাট ও সাম্রাজ্যের আমীর-ওমরাহরা রাজধানীতে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিলাসসম্ভার রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত নরনারীর ব্যবহারের জন্যে আমদানি হ'ত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বণিকেরা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকলেও তাঁরা বিলাসিতার আড়ম্বর দেখাতে ভরসা পেতেন না। লুব্ধ রাজকর্মচারী-ভীতিই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

তখন সমাজে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ বাস করত—ধনী অভিজাত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর অর্থের প্রাচুর্য ছিল এবং তাঁরা সর্বদা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর লোকেরা খুব পরিশ্রমী ছিল এবং সাদাসিধা জীবন যাপন করত। শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের কষ্টের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। তখন জিনিসপত্রের দাম সস্তা হলেও তা ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় জানা যায় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা জনসাধারণের ওপর নানারকম অত্যাচার করতেন। প্রজাদের শোষণ করেই তাঁরা ধনরত্ন সঞ্চয় করতেন। শ্রমিকরা এই সময়ে অত্যাচারী অভিজাতদের কাছ থেকে কদাচিৎ ন্যায্য মূল্য পেত। ব্যবসায়ীরাও তাঁদের কম দামে জিনিস-পত্র বিক্রী করতে বাধ্য হ'ত। জনসাধারণের অবস্থার কথা বিবেচনা করবার সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা শুধু ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নয়। ধনী ও দরিদ্রের এই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সে যুগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা যেত। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা—আর জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও দুর্দশা—এই ছিল মুঘল যুগের সমাজচিত্র।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনদশা

পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি—এ ঘটনা মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে মোটেই নতুন নয়। শাহ্‌জাহান এবং ঔরঙ্গজেব দুজনেই সিংহাসনে বসেছিলেন গায়ের জোরে অন্য ভাইদের পরাজিত করে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুয়াজ্জেম অপর দুই ভাইকে পরাজিত ও নিহত করে বাহাদুর শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। বাহাদুর শাহের ছেলে জাহান্দার শাহও ঠিক একইভাবে অন্য ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে ভাইয়ে-ভাইয়ে মারা-মারি করেই একের পর এক সিংহাসনে বসেছেন ঔরঙ্গজেবের বংশধরেরা। তাঁরা সকলেই ছিলেন অকর্মণ্য, বিলাসী অথচ ক্ষমতালিপ্সু। স্বভাবতঃই তাঁদের আমলে দেশের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ল আর সেই সুযোগে

বিভিন্ন রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে লাগল। মহম্মদ শাহের উজীর নিজাম-উল-মুলুক দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য গঠন করলেন। অযোধ্যা এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারেরা স্বাধীন নবাব হয়ে বসলেন। রোহিলানায়ক আলি মহম্মদ খাঁ রোহিলখণ্ডে রাজ্য গড়লেন। গুজরাট ও মালব মারাঠারা অধিকার করে নিল। পাঞ্জাবে শিখরা শক্তিশালী হয়ে উঠ্‌ল। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এইরকম, ঠিক সেই সময়ে নাদির শাহের আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

ঔরঙ্গজেবের দুর্বল বংশধর এবং নাদির শাহের ভারত আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্যে শুধু এদের দায়ী করলে ভুল হবে। এদের সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, এরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

নাদির শাহ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিজেই। তিনি ছিলেন হিন্দুবিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান। তাই সিংহাসনে বসেই ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর আদেশে হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর, তীর্থ-যাত্রার কর প্রভৃতি পুনঃপ্রবর্তিত হ'ল। তিনি বহু হিন্দু মন্দির অপবিত্র ও ধ্বংস করে রাজ্যের হিন্দু জনসাধারণের বিরাগভাজন হলেন। প্রজারাই রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং যে রাজ্যে প্রজাদের মনে সন্তোষ নেই সে রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ নীতির ফলে হিন্দু-রাজপুতরা যারা আকবরের সময়ে মুঘল শক্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিল—তারাও ক্রমে মুঘলদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। সুতরাং বলা যেতে পারে ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতিই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে আলগা করে দিয়েছিল।

তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল এই যে, তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। দায়িত্বশীল মন্ত্রী ও কর্মচারীদের কাজে তিনি সব সময়ে হস্তক্ষেপ করতেন। স্বভাবতঃই তাঁদের প্রতিটি কাজে সম্রাটের এই হস্তক্ষেপ তাঁরা পছন্দ করতেন না। এইজন্যেই ঔরঙ্গজেব যখন রাজধানী ত্যাগ করে দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।

সাম্রাজ্যের বিশালতাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এখনকার মত সেযুগে রাজ্যে পরিবহন ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগের অভাব হেতু সম্রাটদের পক্ষে সর্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব হ'ত না। তাই সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই সুযোগ নিয়েই প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন।

মুঘল শাসনব্যবস্থায় সম্রাটই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এইরকম শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সম্রাটের ব্যক্তিগত কয়েকটি গুণের ওপর। ঔরঙ্গজেবের পর যাঁরা সম্রাট হয়েছিলেন তাঁদের কারুর মধ্যেই সেরকম কোন গুণই ছিল না। তাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে তাঁরা রোধ করতে পারেননি।

বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রত্যেক সম্রাটকেই প্রায় আজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। এই অবিরাম যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। এর ওপর ছিল আবার বাদশাহ্‌দের বিলাসিতা ও সৌধ নির্মাণের ব্যয়। রাজকোষের এই অর্থাভাবকেও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের গতনের পথ অনেক-খানি প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন তাঁকে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। এইভাবে বহুদিন রাজধানীতে সম্রাটের অনুপস্থিতির ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাদশাহ ও আমীর ওমরাহরা তখন বিলাস-ব্যসনে গা ঢেলে দিয়ে আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। বাবর যুদ্ধ যাত্রার পথে সাঁতরে নদী পার হতেন। কিন্তু শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের সময়ে তাঁদের আমীররাও যানবাহন না হলে এক পা চলতে পারতেন না। অন্যদিকে মারাঠাদের প্রয়োজন ছিল সামান্য। তারা ছিল কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। এই ক্ষিপ্রগতি পার্বত্য যোদ্ধাদের সঙ্গে বিলাসপ্রিয় মুঘল সৈন্যরা এঁটে উঠতে পারত না।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল মুঘলদের আদি বাসভূমি। সেখানকার দুর্ধর্ষ মোঙ্গলবাহিনী নিয়েই বাবর হিন্দুস্থান জয় করেছিলেন। কিন্তু আকবরের পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পারসিক ও উজবেকদের হাতে চলে যায়। ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে সীমান্ত প্রদেশের আফগানরাও ঔরঙ্গজেবের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ভারতীয়দের বিদ্রোহ দমনের জন্যে মুঘল সম্রাটেরা আর আফগান ও মোঙ্গল সৈন্যের কোন সাহায্যই পেলেন না।

নৌশক্তির দুর্বলতাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটা বড় কারণ। মুঘল সম্রাটেরা কেউই নৌশক্তির গুরুত্ব তেমন অনুভব করেননি। ফলে বিস্তীর্ণ সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল একরকম অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়ে ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইওরোপীয় বণিকদের আগমন

পর্তুগীজ

মুঘল যুগে বহু ইওরোপীয় বণিক ভারতে আসে এবং বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজেরা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেই এসেছিল। মুঘল যুগে তারা খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই এবং বাংলাদেশের হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ কুঠি স্থাপিত হয়। পর্তুগীজ বণিকরা কিন্তু এদেশে সৎভাবে কাজ করত না। তারা ছিল একাধারে বণিক, জলদস্যু, দাস-ব্যবসায়ী ও লুণ্ঠনকারী। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট শাহ্‌জাহান পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন। এর ফলে ভারতে পর্তুগীজদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

ওলন্দাজ

পর্তুগীজদের পর ভারতে আসে ওলন্দাজরা। তারা কুঠি ও কেল্লা স্থাপন করে। এখান থেকে তারা পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সতার কাপড় চালান দিত আর তার বিনিময়ে আনত সেদেশের মশলা। প্রথমে তারা সুরাটে একটি কুঠি স্থাপন করে। মধ্যভারত থেকে নীল এনে তারা ইওরোপে পাঠাত। তাদের অন্যান্য উপনিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বাংলা-দেশের চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও বরাহনগর, বিহারের পাটনা, উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং দক্ষিণ ভারতের পুলিকাট মসুলিপত্তন্, নেগাপত্তন ও

কোচিন। ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে ওলন্দাজরা শেষ পর্যন্ত ভারতের মায়া ত্যাগ করে চলে যায়।

ইংরাজ

আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে রাণী এলিজাবেথের সনদ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি ইংরাজ প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। ১৬১৫ সালে এলেন ইংরাজ রাজদূত স্যার টমাস রো। তিন বছর জাহাঙ্গীরের দরবারে থেকে তিনি কোম্পানীর জন্য নানাবিধ বাণিজ্যের সুবিধা এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় কুঠি নির্মাণের অধিকার লাভ করলেন। এইভাবে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের বাণিজ্য কুঠি গড়ে ওঠে।

ফরাসী

সবার শেষে আসে ফরাসীরা। তারা প্রথমে সুরাটে এবং মসুলিপত্তনে কুঠি স্থাপন করে এবং পরে পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরেও ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে ফরাসীদের বাণিজ্য বিস্তার ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে যখন ফরাসী ও ইংরাজ কোম্পানী কুঠি গড়ে বাণিজ্য বিস্তার করছিল তখন ইওরোপের প্রভুত্ব নিয়ে এই দুই জাতির মধ্যেই চলছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয়ের দ্বন্দ্ব ইউরোপ থেকে সংক্রামিত হ'ল ভারতবর্ষে। ঔপনিবেশিক রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফরাসী ও ইংরাজ পরস্পরের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল। এই নাটকে মূল ভূমিকা গ্রহণ করলেন দুপ্লেক্স্ ও ক্লাইভ। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দেশীয় রাজাদের আত্মকলহ ইওরোপীয় বণিকদের কাছে এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের এক মহা সুযোগ এনে দিয়েছিল।

দুপ্লেক্স্ ছিলেন পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্তা। তিনি সর্বপ্রথম ভারতে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে রবার্ট ক্লাইভ এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুপ্লেক্স ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী। তিনি ভেবে দেখলেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে দেশীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করে এদেশে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশ ও হায়দ্রা-বাদের সিংহাসন নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। দুপ্লেক্স্ এই দুই রাজ্যের সিংহাসনপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে দুইজনের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে

যোগদান করলেন। তাঁর অভিসন্ধি সফল হ'ল; কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদে তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিরা সিংহাসন লাভ করলেন। এর ফলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেস্ট বৃদ্ধি পেল। হায়দ্রাবাদের নিজাম দুপ্লেক্স্‌কে এক বিশাল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ফরাসীদের মসুলিপত্তন বন্দরটি দান করেন।

এদিকে বহুকাল ধরে ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব চলছিল। দাক্ষিণাত্যে দুপ্লেক্সের সাফল্য দেখে ইংরাজেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তখন তারাও দাক্ষিণাত্যের গৃহযুদ্ধে যোগ দিল। এই সময়ে

ক্লাইভ

দুপ্লেক্স্‌

রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজের ইংরাজ কুঠিতে কেরাণীর কাজ করতেন। তিনি নিজে সৈন্য পরিচালনা করে কর্ণাটকের ফরাসী আশ্রিত নবাবকে বিতাড়িত করলেন, আর তার জায়গায় নিজেদের আশ্রিত একজন দেশীয় রাজপুত্রকে নবাব করে ঐ রাজ্যে ইংরেজদের প্রভাব বিস্তার করলেন।

এর কয়েক বৎসর পর ইওরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতবর্ষেও তাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইংরাজরা ফরাসীদের রাজধানী পণ্ডিচেরী অবরোধ করে। তখন ফরাসীদের প্রধান সেনাপতি কাউন্ট দ লালী হায়দ্রাবাদ থেকে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসার ফলে সেখানে ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। পণ্ডিচেরীর যুদ্ধে লালী ইংরাজদের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন (১৭৬১)। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফরাসীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার

পূর্বে সহ্যাদ্রি, উত্তরে সাতপুরা পাহাড় আর পশ্চিমে মহাসমুদ্র,—এর মাঝে দাক্ষিণাত্যে যে লম্বা ভূখণ্ডটি আছে তার নাম হল কোঙ্কণ।

রুক্ষ পার্বত্য দেশ, পাহাড়ের ওপর এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এদেশের অধিবাসীরা যেমন সাহসী তেমনি কষ্টসহিষ্ণু। সাধু একনাথ, তুকারাম ও রামদাসের আহ্বানে এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মচেতনা জেগে উঠ্‌ল, এদের ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হ'ল, আর তারা তখন এক জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠ্‌ল। এরাই হ'ল মারাঠা জাতি। যুগনায়ক শিবাজী এদের এক রাষ্ট্রে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন।

শিবাজী ছিলেন পুণা এবং কর্ণাটকের জায়গীরদার শাহজীর পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই শিবাজী এক স্বাধীন মারাঠা রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তাই কিশোর বয়সে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতীয় লোকদের নিয়ে একটি নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করেন। এদের সাহায্যে তিনি ক্রমে বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিয়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য গড়ে তুললেন। ফলে মুঘলদের সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘর্ষ বাধে। কয়েকটি যুদ্ধের পর ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু সম্রাট তাঁকে অপমান করে আগ্রাতে নজরবন্দী করে রাখেন। শিবাজী কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। কয়েক বছর পর হৃত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। ১৬৭৪ সালে রায়গড়ে রাজ্যাভিষেকের পর শিবাজী ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করলেন। তারপর গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি কর্ণাটক আক্রমণ করলেন এবং জিঞ্জী, ভেলোর, তাঞ্জোর, মহীশূরের কিয়দংশ এবং তুঙ্গভদ্রার তীরবর্তী কিছু কিছু অংশ অধিকার করলেন।

১৬৮০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর মারাঠাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মারাঠা রাজ্যের অধিকাংশ মুঘলদের হাতে চলে আসে। শিবাজীর পুত্র শাম্ভাজী যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এরপরে শিবাজীর আর এক পুত্র রাজারাম ও তাঁর স্ত্রী তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব দেন। ঔরঙ্গজেব তাদের দমন করতে পারলেন না। শেষে তাঁর মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যের অধিপতি হন শাম্ভাজীর পুত্র শাহু।

শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক ব্যক্তিকে পেশোয়া (প্রধানমন্ত্রী) পদে নিয়োগ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন পেশোয়া আপন বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের জোরে রাজ্যের মধ্যে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। ক্রমে মারাঠারা হয়ে উঠ্‌ল বাদশাহের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতবর্ষের ভাবী ভাগ্যনিয়ন্তা।

১৭২০ সালে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর পেশোয়া হলেন তাঁর পুত্র

বাজীরাও। এখন থেকে পেশোয়া পদ বংশগত হয়ে দাঁড়াল আর পেশোয়াই হয়ে উঠলেন মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর। বাজীরাও ক্ষীয়মাণ মুঘল সাম্রাজ্য অপসারণ করে ভারতবর্ষে 'হিন্দু বাদশাহী' স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন। তিনি একে একে মালব ও গুজরাট অধিকার করে নিলেন। এর পর বাজীরাও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব আক্রমণ করে একেবারে দিল্লীর দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। নিরুপায় বাদশাহ্ নিজামের শরণাপন্ন হলেন। ভূপালের কাছে নিজামের বাহিনী বাজীরাও-এর হাতে পরাস্ত হ'ল।

বাজীরাও যেমন মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন, তেমনি আবার তাঁর সময়েই মারাঠা রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে এক রাজ্য সংঘের আকার ধারণ করল। বেরারে ভোঁসলে বংশ, বরোদায় গায়কোয়াড় বংশ, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া বংশ এবং ইন্দোরে হোলকার বংশ রাজত্ব করতে লাগল। কেবল মহারাষ্ট্র রইল পেশোয়ার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে।

বাজীরাও-এর পর পেশোয়া হলেন তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন সাম্রাজ্য-অভিলাষী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর আমলে মারাঠারা কৃষ্ণা নদী পার হয়ে মহীশূর ও কর্ণাটকের কিছু অংশে প্রভুত্ব স্থাপন করে। বিজাপুর, ঔরঙ্গাবাদ ও বিদরের কিছু অংশও পেশোয়ার করায়ত্ত হ'ল। ১৭৫৬ সালে গঙ্গা-যমুনা দোয়বে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর পেশোয়া তাঁর চরম শত্রুর সম্মুখীন হলেন।

১৭৪৮ সালে পর পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করে আফগানরাজ আহম্মদ শাহ্ আবদালী মুঘল সম্রাটকে পরাজিত করেন। এর ফলে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব তাঁর অধিকারে আসে। দিল্লীতে বাদশাহকে পরিচালনা করবার জন্যে তাঁর একজন প্রতিনিধিকে রেখে যান। পরে মারাঠারা দিল্লী আক্রমণ করে আফগান প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দেয়। আহম্মদ শাহ্ আবদালী তখন মারাঠাদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ১৭৬১ সালে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আফগান ও মারাঠা শক্তির ভাগ্যপরীক্ষা হ'ল। যুদ্ধে মারাঠারা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলে পেশোয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। ভারতবর্ষে একচ্ছত্র মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এই যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ে পেশোয়ার প্রতিপত্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হ'ল। সেই সুযোগে সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে ও গায়কোয়াড় পেশোয়ার আধিপত্য অস্বীকার করে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন। এইভাবে মারাঠাচক্র ভেঙ্গে গিয়ে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ল। আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণে

মুঘল ও মারাঠা উভয়েই হীনবল হয়ে পড়ায় ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ইংরাজদের প্রায় সকল বাধা দূর হয়ে গেল। ফলে মারাঠাদের পক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইংরাজ আধিপত্য প্রতিরোধ করা আর সম্ভব হল না।

শিখজাতির অভ্যুত্থান

শিখজাতি পাঞ্জাবে বাস করত। আহম্মদ শাহ্ আবদালীর ভারত ত্যাগের পর স্বাধীন হলেও শিখরা তখন বারটি ছোট ছোট রাজ্যগোষ্ঠিতে বিভক্ত ছিল। ইংরাজ সাম্রাজ্য যখন নর্মদা ও যমুনা থেকে ধীরে ধীরে সিন্ধুনদের দিকে বিস্তার লাভ করে চলেছে তখন তারা নিজেদের ছোটখাটো স্বার্থ নিয়ে পরস্পর গৃহবিবাদে মত্ত। এই দুঃসময়ে এক জাতীয় নায়কের আবির্ভাব হ'ল। তাঁর নাম রণজিৎ সিংহ। তিনি শিখদের সঙ্ঘবদ্ধ করে পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করলেন।

আগেই বলেছি আহম্মদ শাহ আবদালীর সময় থেকে পাঞ্জাবে আফগান আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। জামান শাহ্ নামে একজন আফগান রাজা শিখ নেতা রণজিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শিখেরা তখন কতকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত। রণজিৎ এদের একতাবদ্ধ করলেন এবং আফগানদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করলেন। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরের শিখেরা কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী হ'ল না। তিনি তাদেরও নিজের অধীনে আনতে চেষ্টা করেন। তারা তখন ইংরাজদের শরণাপন্ন হ'ল। ইংরাজদের বলবিক্রমের কথা রণজিতের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি তাদের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। অমৃতসরের সন্ধিতে শতদ্রু নদী ইংরাজ ও শিখরাজ্যের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত হ'ল। শতদ্রুর দক্ষিণে অবস্থিত শিখরা ইংরাজদের বশীভূত হ'ল।

রণজিৎ সিংহ

দক্ষিণদিকে প্রতিহত হয়ে রণজিৎ উত্তর ও পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করলেন। গুর্খাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি কাংড়া জেলা জয় করেন। আফগানদের পরাস্ত করে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আটক দুর্গ ও পেশোয়ার নগর অধিকার করে নেন। উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলতান তাঁর রাজ্যভুক্ত হ'ল। ১৮৩৯ সালে ইংরাজ সাম্রাজ্যের সীমান্তে একটি সুদৃঢ় সামরিক রাজ্য গঠন করে রণজিৎ সিংহ পরলোকগমন করেন।

শিখজাতির ইতিহাসে রণজিৎ সিংহের স্থান গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের সমপর্যায়ে। আকবর ও শিবাজীর মত তিনিও লেখাপড়া শেখেননি। কিন্তু তিনি অসামান্য সামরিক ও সংগঠন প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হাতে গুরু গোবিন্দের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ধর্মপ্রাণ, ঐক্যবদ্ধ এবং সমরকুশল খাল্‌সা বাহিনী সৃষ্টি করেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার
(১৮৫৭ সাল পর্যন্ত)

প্রথম পর্ব—১৮১৮ সাল পর্যন্ত

দক্ষিণ ভারতে যখন ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তখন বাংলাদেশের নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ। নবাব আলিবর্দী খাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুর আগেই তাঁর দৌহিত্র (কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র) সিরাজকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

পলাশীর যুদ্ধ

নবাব হবার আগে থেকেই সিরাজের সঙ্গে ইংরাজদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। ইংরাজেরা ভালভাবেই জানতো যে, ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে সিরাজের সমর্থন ছিল ফরাসীদের প্রতি। সুতরাং সিরাজ যতদিন বাংলার নবাব থাকবেন ততদিন বাংলাদেশে ইংরাজদের স্বার্থ সিদ্ধ হবে না জেনে ইংরাজেরা তখন অন্য পথ অবলম্বন করল। সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর সিরাজকে সরিয়ে নবাবীপদ লাভের জন্যে গোপনে ষড়যন্ত্র করছিলেন। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠের মত প্রভাবশালী লোকেরাও ক্রমে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। ক্লাইভ এসে যোগ দিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে। মীরজাফর, উমিচাঁদ ও ক্লাইভের মধ্যে গোপনে স্থির হ'ল যে, মীরজাফর নবাব হবেন এবং তার বিনিময়ে উমিচাঁদ, ইংরাজ কোম্পানী এবং নবাবের কাছ থেকে প্রচুর পারিতোষিক লাভ করবে। এইভাবে সমস্ত দিক গুছিয়ে নিয়ে তারপর সামান্য অজুহাতে ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধ **পলাশীর যুদ্ধ** নামে পরিচিত। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে নবাবের ফৌজ ক্লাইভের হাতে পরাস্ত হ'ল। ক্লাইভ ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুযায়ী মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে কার্যতঃ নিজেই নবাবী চালাতে লাগলেন। কোম্পানী প্রচুর অর্থ এবং চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ করল। এই যুদ্ধের পর থেকেই কোম্পানী সামান্য একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে শুরু করে।

সিরাজদৌল্লা

তারপর মীরজাফর যখন আর টাকা জোগাতে পারলেন না তখন ইংরাজেরা তাঁকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসাল। মীরকাসিম কিন্তু মীরজাফরের মত ইংরাজদের তাঁবেদার হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন ইংরাজদের প্রাপ্য যথাসত্বর কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে।

মীরকাসিমের রাজত্বে কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে ইংরাজেরা মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অযোধ্যার নবাব, দিল্লীর সম্রাট এবং মীরকাসিমের মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজদের কাছে পরাস্ত হ'ল। ইংরাজেরা মীরকাসিমকে সরিয়ে আবার মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাল। বাংলায় কোম্পানীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত

মীরজাফর মীরকাশিম

করবার জন্যে ক্লাইভ তখন কামনা করছিলেন মুঘল সম্রাট এবং অযোধ্যার নবাব উভয়েরই আন্তরিক সহযোগিতা। তাই তাঁদের কাউকেই না চটিয়ে তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলেন।

দ্বৈতশাসন

অতঃপর অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে পাওয়া এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ দুটি আর সেই সঙ্গে আরও বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাইভ মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলেন। দেওয়ানী লাভের অর্থ কোম্পানী ঐ প্রদেশের খাজনা আদায় ও ভোগ করবার এবং দেওয়ানী মামলার বিচারের অধিকার পেল। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের হাতে রইল শুধু শান্তিরক্ষা ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার। এই ব্যবস্থাই দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত।

এইভাবে বাংলাদেশে কিছুটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইংরাজদের

নজর পড়ল দাক্ষিণাত্যের দিকে। দাক্ষিণাত্যে তখন মহীশূর, হায়দ্রাবাদ এবং মারাঠা রাজ্যের আধিপত্য চলছে। এই তিনটি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বিশেষ কোন সদ্ভাব ছিল না। তাই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। ইংরাজেরা সেই সুযোগে প্রথমে মহীশূর রাজ্যটিকে গ্রাস করার জন্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

মহীশূরের প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে সেই সময়ে হায়দর আলি নামে এক ফৌজদার রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমে মালাবার অধিকার করে তিনি সমুদ্রতীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। হায়দর আলির ক্ষমতাবৃদ্ধিতে নিজাম ও মারাঠা উভয়পক্ষই শঙ্কিত হয়ে উঠল। এই অবস্থায় নিজামকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরাজেরা নিজামের রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করে নেয়। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারের পর হায়দরকে প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে বলে ইংরাজেরা

হায়দর আলি টিপু সুলতান

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় মারাঠা, নিজাম এবং হায়দর আলি মিলিত হয়ে এক ইংরাজ বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন করলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোন নিষ্পত্তি হয়নি। এই যুদ্ধে হায়দর আলির মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। টিপু ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং উচ্চাভিলাষী। নিজাম ও মারাঠারাও ছিল টিপুর শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত। তাই ইংরাজেরা সহজেই নিজাম ও পেশোয়াকে দলে টেনে নিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল। টিপু পরাজিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য

হলেন। টিপুকে অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিতে হ'ল। তার অধিকাংশ পেল ইংরাজ আর কিছু পেলেন নিজাম ও পেশোয়া।

করদ-মৈত্রী নীতি

দেশীয় রাজন্যবর্গের ওপর ইংরাজদের প্রভাব কায়েম করার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলী অধীনতামূলক মিত্রতা বা করদ-মৈত্রী নামে এক নীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। এতে বলা হ'ল, যারা এই নীতি গ্রহণ করবে তাদের কয়েকটি শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন, (ক) নিজেদের বৈদেশিক নীতি ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; (খ) ইংরাজ ছাড়া আর কোন বৈদেশিক রাজ্যের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা চলবে না; (গ) তাদের রাজ্যের মধ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন থাকবে। এই শর্তগুলি মেনে চললে ইংরাজেরা শত্রু আক্রমণ থেকে তাদের রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের মৈত্রী দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি যুদ্ধে মারাঠাদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর হায়দ্রাবাদের হীনবল নিজাম সর্বপ্রথম ইংরাজদের এই চুক্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু টিপু সুলতান এই চুক্তি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। টিপু পরাজিত ও নিহত হলেন। মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণের জেলাগুলি পেল ইংরাজরা। সামান্য কিছু পেলেন নিজাম। অবশিষ্ট অংশে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু-বংশের রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সেই হিন্দু রাজা ইংরাজদের করদ-মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এইভাবে মহীশূরের শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেল।

ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক

বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর পেশোয়া হয়েছিলেন তাঁর পুত্র প্রথম মাধব রাও। তাঁরই আমলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা রাজ্য অনেকদূর প্রসারিত হয়েছিল। উত্তরে মালব, রাজপুতানা এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াবেও মারাঠারা তখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই মারাঠারা আবার অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ল। পেশোয়া পদ নিয়ে শুরু হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুর্বল পক্ষ ইংরাজদের শরণাপন্ন হল, আর সেই সুযোগে ইংরাজেরাও তাদের পেশোয়া বলে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তাদের নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে খুব সবিধা হয়েছিল। এইভাবে ইংরাজদের কৃপায় সুরাটের সন্ধিতে রঘুনাথ রাও এবং সলবাইয়ের সন্ধিতে দ্বিতীয় মাধব রাও পেশোয়া বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর পেশোয়ার আসন নিয়ে আবার ষড়যন্ত্র ও কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। অবশেষে পেশোয়া হলেন রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও। অপর দিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের ঐক্য তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। বেরারে ভোঁসলে, বরোদায় গায়কোয়াড় এবং ইন্দোরে হোলকার সবাই নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এই অবকাশে হোলকার পেশোয়ার রাজধানী পুণা অধিকার করে নিলেন। পেশোয়া তখন ইংরাজদের শরণাপন্ন হলেন। এর আগে মারাঠারা একাধিকবার ওয়েলেসলীর ঘৃণ্য করদ-মৈত্রী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বাজীরাও এখন নিজের স্বার্থে ইংরাজদের শরণাপন্ন হয়ে বেসিনের সন্ধিতে সেই করদ-মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। ইংরাজরা এতদিনে মারাঠাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগ পেল। এই জাতীয় দুর্দিনেও মারাঠারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। ফলে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া পৃথকভাবে করদ-মৈত্রী গ্রহণ করলেন। ১৮০৫ সালে গায়কোয়াড়ও সন্ধি করে ইংরাজ প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এখন বাকী রইলেন শুধু হোলকার। কিন্তু তিনিও পরাজিত হয়ে ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর বাজীরাও ইংরাজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দেন। তাই ইংরাজরা তখন পেশোয়াকে পুণার চুক্তি সই করতে বাধ্য করে। এই চুক্তি অনুযায়ী পেশোয়াকে মারাঠা চক্রের নায়কের পদ থেকে ইস্তফা দিতে হ'ল। তারপর সিন্ধিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত হ'ল গোয়ালিয়র চুক্তি। এই চুক্তিতে ইংরাজরা রাজপুত রাজ্যগুলির ওপর নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। অপর একটি চুক্তি সই করে নাগপুর নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ইংরাজদের করদ-রাজ্যে পরিণত হ'ল। তবুও মারাঠারা রণে ভঙ্গ দিল না। কিন্তু একে একে সকলকেই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। মারাঠা রাজ্যগুলির অধিকাংশই কোম্পানী গ্রাস করে নিল। অবশিষ্ট অংশ নিয়ে রাজারা ইংরাজদের সঙ্গে করদ-মৈত্রী পাশে আবদ্ধ রইলেন। রাজপুত রাজারা সিন্ধিয়া ও হোলকারের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ইংরাজদের করদ-মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এইভাবে ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে মুঘল ও মারাঠার শূন্যস্থানে উদিত হ'ল ইংরাজ।

গুর্খাযুদ্ধ

১৭৬৮ সালে গুর্খা নামে এক পার্বত্য জাতি নেপালে আধিপত্য স্থাপন করে। তারা হিমালয়ের পাদদেশে ভারতের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য

বিস্তার করেছিল। ইংরাজরাও তখন গোরক্ষপুর জয় করে তরাই অঞ্চলে নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছে। এই সীমান্ত নিয়ে গুর্খা ও ইংরাজদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। অবশেষে গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইংরাজরা তাদের পরাস্ত করে। ১৮১৫ সালে সগৌলির সন্ধিতে গুর্খারা পশ্চিমে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন, দক্ষিণে তরাই দেশ ও পূর্বে সিকিম ইংরাজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে একজন ইংরাজ রাজদূত উপদেষ্টারূপে অধিষ্ঠিত হলেন।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ পর্ব—১৮৫৭ সাল পর্যন্ত

পাঞ্জাব অধিকার

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের দু'বার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে শিখ সৈন্যরা খুব বীরত্ব এবং সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের সেনাপতিদের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তারা পরে হেরে যায়। লাহোর সন্ধির শর্ত অনুসারে শিখরা প্রচুর খেসারত সহ শতদ্রুর দক্ষিণের যাবতীয় ভূমি, শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব এবং উত্তরে কাশ্মীর ও জম্মু ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও শিখেরা ইংরাজদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয় এবং তারপর এক ঘোষণা দ্বারা ১৮৪৯ সালে ডালহৌসী পাঞ্জাবকে ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে ইংরাজদের এক আশ্রিত রাজা অধিষ্ঠিত হলেন।

সিন্ধুদেশ জয়

পাঞ্জাব জয়ের কিছু আগে ইংরাজরা সিন্ধু দেশ জয় করেছিল। মূলত সিন্ধুদেশ ছিল আহম্মদ শাহ দুররানীর সাম্রাজ্যভুক্ত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এখানকার আমীররা আফগান আধিপত্য ছিন্ন করে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে সিন্ধুদেশটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে ছিল কোম্পানীর বাণিজ্যের ঘাঁটি এবং সাম্রাজ্যের সীমান্ত। তাই সেখান থেকে ফরাসীদের প্রভাব বিলুপ্ত করবার জন্যে ইংরাজরা সেখানকার আমীরদের সঙ্গে পর পর দুটি চুক্তি করে। কিন্তু তাদের বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হয়ে লর্ড এলেনবরো এই প্রদেশটি আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। তখন সেনাপতি নেপিয়ার আমীরদের পরাজিত করে সিন্ধুদেশ জয় করেন।

ব্রহ্মদেশ জয়

ইংরাজরা যখন ভারতে রাজ্যস্থাপনে ব্যস্ত তখন ব্রহ্মদেশের রাজারা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। ১৮১৬ সালে ব্রহ্মদেশের রাজা আসাম জয় করেন। তারপর তিনি ইংরাজদের কাছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার ছেড়ে দেবার জন্যে দাবি জানাতে থাকেন। এই কারণে তাদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথম বারের যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করে (১৮২৬)। এই যুদ্ধের প্রায় পঁচিশ বছর পরে ইংরাজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মদেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পেগু প্রদেশটি জোর করে কেড়ে নেন। আরও প্রায় ত্রিশ বছর পরে ফরাসীদের সঙ্গে একত্র হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ইংরাজ ও ব্রহ্মদেশের রাজার মধ্যে আবার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধের শেষেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়।

স্বত্ববিলোপ নীতি দ্বারা দেশীয়রাজ্য অধিকার

তোমরা আগেই পড়েছ লর্ড ওয়েলেসলী অধীনতামূলক মিত্রতা অথবা করদ-মৈত্রী নীতি প্রয়োগ করে একে একে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ এবং মারাঠা রাজ্যের ওপর কিভাবে ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসীও দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি ইংরাজদের অধীনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে 'স্বত্ববিলোপ নীতি' নামে একটি নীতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই নীতির মূল বক্তব্য হ'ল ইংরাজদের আশ্রিত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেই রাজ্য কোম্পানীর অধীনে চলে যাবে এবং কোন রাজ্যে দত্তকপুত্রের অধিকার স্বীকৃত হবে না। এই নীতি প্রয়োগ করে ডালহৌসী একে একে সাঁতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করে নিলেন।

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য লিপ্সা এতই প্রবল ছিল যে, সিকিমের রাজা দুজন ইংরাজ প্রজাকে উৎপীড়ন করলে তিনি তাঁর রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নেন। ঋণের দায়ে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে তিনি বেরার প্রদেশটি কেড়ে নিয়েছিলেন। কুশাসনের দোহাই পেড়ে ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্যটিকেও কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করে নেন। ছলে-বলে-কৌশলে ভারতে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার করাই ছিল ডালহৌসীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য যে তাঁর সফল হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই ভারতের প্রায় আসমুদ্র হিমাচল কোম্পানীর যে সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল তার মূলে ডালহৌসীর অবদান বড় কম নয়।

সিপাহী বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় —(১) রাজনৈতিক; (২) অর্থনৈতিক; (৩) সামাজিক এবং (৪) সামরিক।

রাজনৈতিক কারণ

ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, নাগপুর, ঝাঁন্সী, সম্বলপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি অধিকার করে নিয়েছিলেন। বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যা রাজ্যটিও কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ল। ডালহৌসীর এইসব কার্যকলাপ দেশীয় রাজন্যবর্গের অন্তরে অসন্তোষের সৃষ্টি করছিল। এইসব রাজ্য অধিকারের সময়ে রাজপ্রাসাদগুলি লুণ্ঠন করে ইংরাজরা তাদের অসন্তোষের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই অমানবিক নীতি সমগ্র ভারতে এক বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করল।

অর্থনৈতিক কারণ

দীর্ঘ একশ' বছর ধরে ইংরাজ শোষণের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। কোম্পানীর নতুন রাজস্বনীতিও দুরবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি করছিল। বিলাতী পণ্য আমদানির ফলে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। দেশে বেকার সমস্যা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করল। দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কোম্পানী কোন কর্মসূচীই গ্রহণ করেনি। দেশের এই চরম আর্থিক অবস্থার মধ্যে কোম্পানী আবার নতুন নতুন কর স্থাপন করতে শুরু করল। এইভাবে সমাজের সর্বস্তরে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসনের কুফল প্রকট হয়ে উঠল।

সামাজিক কারণ

ভারতে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। সেই সঙ্গে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রচলনের ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি হ'ল। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল সন্দেহ নেই। এই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা তখন সমাজ থেকে কু-সংস্কার দূর করার জন্যে সোচ্চার হ'য়ে উঠলেন। প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ প্রথা আইনসিদ্ধ হয় এবং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সমাজে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা

ছিল নগণ্য। তাই এই সব সংস্কারের প্রতি সমাজের অধিকাংশ মানুষের কোন সমর্থন ছিল না। এই সব সংস্কার যেন একরকম জোর করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই স্বভাবতঃই তাদের আশঙ্কা

হ'ল এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে। এর ওপর মিশনারীদের দেশের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে দেখে তাদের বদ্ধমূল ধারণা হ'ল যে, ইংরাজরা ভারতবাসীদের ধর্মান্তরিত করবার জন্যেই

এইসব করছে। এইভাবে সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করে ইংরাজরা হিন্দু মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে যে আঘাত হেনেছিল তার জন্যই তারা ইংরাজদের প্রতি ক্রমশঃ বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে।

সামরিক কারণ

সেযুগে সামরিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও নানারূপ গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। সামরিক প্রয়োজনে সামরিক কর্মচারীদের নিজেদের দেশ ঘর ছেড়ে দূরবর্তী প্রদেশে যেতে হ'ত বলে তারা কোম্পানীর কাছে একটা অতিরিক্ত ভাতা দাবি করে। কিন্তু কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের সে দাবি মঞ্জুর না করায় তাদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

এর ওপর সামরিক বিভাগে ইংরাজ সৈন্যদের ওপর অযথা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হ'ত। ভারতীয় সৈনিকদের তুলনায় তাদের বেতন ছিল অনেক বেশি এবং বহু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাও তারা ভোগ করত যা ভারতীয় সৈন্যদের ভাগ্যে জুটত না। এই পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের জন্য ভারতীয় সিপাহীরা মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না।

সেযুগে সমুদ্রযাত্রা করলে জাতিচ্যুত হতে হবে—এইরকম একটা ধারণা গোঁড়া হিন্দুদের মনে ছিল। সেই কারণে সমদ্র পার হয়ে ব্রহ্মদেশে তাদের যখন যুদ্ধ করতে যেতে বাধ্য করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ইওরোপে তখন ইংরাজ ও রুশদের মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে বহু ইংরাজ সৈন্যকে ভারতবর্ষ থেকে ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে ভারতের সেনাবাহিনীতে ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা যখন কমে এল, তখন থেকে ভারতীয় সিপাহীরা তৎপর হয়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু এই বিদ্রোহের একমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন। এই রাইফেলের টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে পূরতে হ'ত। কোন দুষ্টবুদ্ধি লোক প্রচার করল যে, ঐ টোটার মধ্যে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই জাতিচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজরা এই হীন কৌশল অবলম্বন করেছে। সিপাহীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ায় তারা প্রকাশ্যভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী ব্যক্তিগতভাবে প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মঙ্গল পাণ্ডেকে

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেও বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করা সম্ভব হ'ল না। মঙ্গল পাণ্ডের দণ্ডাদেশ আগুনে যেন ঘি ছড়িয়ে দিল। ক্রমে অন্যান্য সেনানিবাসেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশ থেকে মীরাট, দিল্লী, অযোধ্যা ও মধ্যভারতে বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিদ্রোহীরা ইংরাজ দেখলেই তাদের হত্যা করত আর তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিত। মীরাট থেকে একদল বিদ্রোহী দিল্লী অধিকার করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করল। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন নানা সাহেব। তিনি বহু ইংরাজকে নিষ্ঠুরভাবে

বাহাদুর শাহ নানা সাহেব

হত্যা করেন। ঝাঁন্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে মিলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁতিয়া তোপী ইংরাজদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ইংরাজদের চোখে ধুলো দিয়ে নানা সাহেব নেপালে ফেরারী জীবন যাপন করতে লাগলেন। দেড় বছর সংগ্রামের পর বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল।

অনেকে সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনরূপে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু অনেকে আবার এই মত সমর্থন করেন না। তাঁদের যুক্তি হ'ল যে, ভারতবর্ষকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করব—এরকম মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লেগেছিল বলেই তারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেছিল। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই যে আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সে আন্দোলনকে কখনই জাতীয় আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আন্দোলনের পেছনে থাকে, গণসমর্থন।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগই ছিল না। এই জন্যেই অনেকের মতে সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের পর্যায়ে পড়ে না।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীদের মধ্যে সংহতির অভাবই বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব হেতু সব জায়গায় একই সময়ে বিদ্রোহের সূচনা করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় ইংরাজদের পক্ষে তা দমন করা সহজ হয়েছিল।

তাঁতিয়া তোপী   লক্ষ্মীবাঈ

দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীদলের নেতৃবর্গ এক লক্ষ্য সামনে রেখে কেউই অগ্রসর হননি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা বিদ্রোহী-দলে যোগদান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নানা সাহেব চেয়েছিলেন নিজে পেশোয়া হয়ে ভারতে তিনি মারাঠা প্রাধান্য পুনঃ স্থাপন করবেন। অপরদিকে মুঘল প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করাই ছিল বাহাদুর শাহের লক্ষ্য।

তৃতীয়তঃ বিক্ষিপ্তভাবে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল বলে এর পরিধি আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই এই বিদ্রোহ সর্ব-ভারতীয় আকার গ্রহণ করতে পারেনি।

যোগ্য নেতার অভাবও বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে নির্দেশ করা যেতে পারে। তাঁতিয়া টোপী, নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি

নেতারা আপন আপন সীমার মধ্যে দক্ষতার পরিচয় দিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের সামগ্রিক পরিচালনার ক্ষমতা তাঁদের কারুরই ছিল না।

এই বিদ্রোহ কেবল সেনাবাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই বিদ্রোহের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

স্থাপিত হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিল বলা চলে।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলির মধ্যে বৃটিশ কূট-কৌশলেরও উল্লেখ করতে হয়। ভীতি প্রদর্শন ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাঁরা বিদ্রোহী-দলের অনেককেই স্বপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের কূটকৌশলেই দুর্ধর্ষ গুর্খাবাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরাজদের পক্ষে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এছাড়া বৃটিশ সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, সামরিক দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ব বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

বৃটিশ শাসনের ফলাফল

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় একশ' বছরের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে চুরমার করে দিয়ে ইংরাজ বণিকের দল ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনেও এক বিপর্যয় দেখা দিল। এই বিপর্যয় ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের মনে ইংরাজবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মনোভাব গড়ে ওঠেনি। কোম্পানীর শাসনের শুরু থেকে এদেশে ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী যে অসংখ্য কার্যকলাপের নজির ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে তাই ধীরে ধীরে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে ভারতীয়দের মনে ইংরাজ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল।

ক্লাইভ মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেছিলেন। এই দেওয়ানী লাভের দ্বারা কোম্পানী ঐ প্রদেশের খাজনা আদায় ও ভোগ করবার এবং দেওয়ানী মামলার বিচারের অধিকার পেল। তাই কোম্পানীর তখন উদ্দেশ্য হ'ল প্রজাদের ওপর চাপ দিয়ে যথাসম্ভব বেশি খাজনা আদায় করা। প্রজাদের ভালমন্দ বিচার না করে কোম্পানীর দেওয়ানরা নির্মমভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে লাগলেন। কোম্পানীর দেওয়ানদের অত্যাচারে বাংলার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অত্যাচারী শাসকের নগ্নরূপ ভারতবাসীর অন্তরে বিভীষিকার সৃষ্টি করল।

অর্থের জন্য হেস্টিংসও যে হীন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তাও ভারতবাসীর অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার করে। উৎপীড়ন করে অযোধ্যার বেগমদের কাছ থেকে যেভাবে তিনি অর্থ আদায় করেছিলেন তা হেস্টিংসের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করেছিল। বেগমদের প্রতি এই অপমানসূচক

ব্যবহারে অযোধ্যার নবাবের অনুগত প্রজাবৃন্দ স্বভাবতঃই কোম্পানীর ওপর ক্ষুব্ধ হ'ল। তাছাড়া বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি তাঁর অন্যায় ব্যবহারও আদৌ সমর্থনযোগ্য ছিল না। রাজার প্রতি তাঁর অপমান-সূচক ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে রাজার বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী ইংরাজদের বিরুদ্ধে

ওয়ারেন হেস্টিংস

ওয়েলেসলী

প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এছাড়া হেস্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে উইল জালের মিথ্যা অভিযোগ এনে যেভাবে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন তাও ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালীদের অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারেরা জমির প্রকৃত মালিক হওয়ায় ইংরাজরা তাদের আনুগত্য লাভ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতার জন্য বহু জমিদারের জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। এর ফলে সেইসব বঞ্চিতের দল স্বভাবতঃই ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

ওয়েলেসলী তাঁর করদ-মৈত্রী নীতি দ্বারা যেভাবে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা খর্ব করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাতে দেশীয় রাজন্যবর্গের অন্তরে ক্রমেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তারপর স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ডালহৌসী যখন একে একে সাঁতারা, ঝাঁন্সী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি গ্রাস করে নিলেন তখন দেশীয় রাজন্যবর্গের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হ'ল।

এইভাবে একের পর এক দেশীয় রাজ্য লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শাসনকার্য এবং সেনাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং ইংরাজরা তাদের পুনর্বাসনের জন্যে কোন ব্যবস্থাই

গ্রহণ করেনি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে ইংরাজদের কোন উৎসাহ ছিল না। উপরন্তু নিজেদের স্বার্থে দেশের শিল্প-বাণিজ্যগুলিকে তারা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। দেশে শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি এবং সেই সঙ্গে বহু লোকের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হওয়াতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করতে থাকে। কোম্পানীর রাজত্বের শুরু থেকেই ইংরাজরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নীলচাষের জন্য কুঠি স্থাপন করেছিল। চাষীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ইংরাজরা তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত। গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা, নীলকর সাহেবদের ভয়ে সব সময়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। দেশের সাধারণ মানুষ যাদের সঙ্গে দেশের রাজনীতির কোন সংস্রব ছিল না তারা পর্যন্ত এই কারণেই ইংরাজ শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। সাধারণ-ভাবে বলা যায়, ইংরাজ শাসনে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মনে বিভিন্ন কারণে যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ তারই এক অভিব্যক্তি।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ—বিপ্লবের যুগ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

স্টুয়ার্ট যুগে যখন রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তখন বহু ইংরাজ দেশ ছেড়ে আমেরিকাতে চলে যায়। আমেরিকা তখন জনবিরল ও বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। নতুন আগন্তুকেরা বহু চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়ে ছোট ছোট সভ্য সমাজ গড়ে তোলে। ক্রমে এরা উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে তেরটি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপন করে। আমেরিকাই তখন থেকে হ'ল এদের মাতৃভূমি।

ইংলণ্ড থেকে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'ল না। সেখানকার রাজাকে তারা রাজা বলে মেনে নিয়েছিল। প্রত্যেক উপনিবেশের জন্যে ইংলণ্ড থেকে একজন করে শাসনকর্তা আসতেন। তাঁরা ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে মিলেমিশে শাসনকার্য চালাতেন। প্রত্যেক উপনিবেশে সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত ছোট ছোট পার্লামেন্টের সাহায্যে আইন-কানুন তৈরী হ'ত। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে উপনিবেশগুলিকে কয়েকটি বিশেষ আইন মেনে চলতে হ'ত; যেমন, ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশ থেকে এরা কোন জিনিস আমদানি বা রপ্তানি করতে পারত না। কিন্তু ঔপনিবেশিকরা এই আইন সব সময়ে মেনে চলত না এবং সরকারী কর্মচারীরাও তা কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করত না। কাজেই ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে মোটামুটি সদ্ভাব ছিল।

ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ

এইভাবে প্রায় দেড়শ' বছর কেটে যাবার পর উপনিবেশগুলির মধ্যে দারুণ অশান্তি দেখা দিল। এতদিন ধরে তারা ইংরাজদের কর্তৃত্ব সহ্য করে আসছিল একটি বিশেষ কারণে। আমেরিকার উত্তরে কানাডা ছিল তখন ফরাসীদের হাতে। তাই তারা ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু ইংরাজরা যুদ্ধ করে ফরাসীদের কাছ থেকে কানাডা রাজ্যটি যখন

কেড়ে নিল তখন আমেরিকাবাসীদের মন থেকে ফরাসীভীতি দূর হয়ে গেল। তারা আর ইংরাজদের অধীনে থাকতে চাইল না।

ফরাসীদের হাত থেকে ঔপনিবেশিকদের রক্ষা করার জন্য সেদেশে সব সময়ে যে সৈন্য মোতায়েন রাখতে হ'ত তাতে ইংলণ্ডের প্রচুর টাকা খরচ হ'ত। তাই ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের একদল লোক মনে করলেন যে, ঔপনিবেশিকদেরই তাদের দেশরক্ষার ব্যয়ভার বহন করা উচিত। কাজেই তখন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের আইনগুলি খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি ছোটখাটো করভার তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হোল। এতে ঔপনিবেশিকরা ইংরাজদের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রেণভিল স্ট্যাম্প অ্যাক্ট নামে একটি আইন জারি করলেন। এতে স্থির হ'ল যে, আমেরিকাতে সমস্ত দলিল নির্ধারিত মূল্যের স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজের ওপর লিখতে হবে। আর এ থেকে যে টাকা আয় হবে তা সেখানকার সরকারী খরচ প্রভৃতির জন্য ব্যয় হবে। আমেরিকাবাসীরা এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল। তারা বলল যে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই, কাজেই সে পার্লামেন্ট তাদের ওপর কোন কর বসাতে পারে না।

গ্রেণভিলের পর প্রধানমন্ত্রী হলেন রকিংহাম। তিনি স্ট্যাম্প আইন তুলে দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমেরিকাবাসীদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের জন্য আইন তৈরী করবার এবং কর বসাবার পূর্ণ অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের আছে।

এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে টাউনশেণ্ড নামে একজন মন্ত্রী আমেরিকাতে আমদানি করা চা, কাচ, কাগজ, রঙ্ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসের ওপর কর বসালেন। এতে আমেরিকাবাসীরা ক্ষেপে গিয়ে ঐ সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করে দিল। তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ একমাত্র চায়ের ওপর ছাড়া আর সমস্ত কর উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এতে কোন ফল হ'ল না। বোস্টন শহরের কয়েকজন লোক একদিন রাতের অন্ধকারে রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশ ধরে একখানা চা বোঝাই জাহাজে উঠে সমস্ত চা সমুদ্রে ফেলে দিল। এই খবর পেয়ে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিয়ে ম্যাসাচুসেট্স্ উপনিবেশের স্বায়ত্তশাসন অধিকার বাতিল করে দিলেন। সরকারী হুকুম যাতে কেউ অমান্য করতে না পারে সেজন্য ইংলণ্ড থেকে যুদ্ধজাহাজ এবং সৈন্যসামন্ত পাঠান হ'ল। সুতরাং উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

এই পরিস্থিতিতে কি করা যেতে পারে তা স্থির করবার জন্যে প্রত্যেকটি উপনিবেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সভা আহ্বান করা হ'ল। জাতীয় সভার প্রস্তাব অনুসারে একটি আবেদনপত্র ইংলণ্ডের রাজার কাছে পাঠান হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না দেখে অবশেষে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তেরটি উপনিবেশের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হ'ল। বিদ্রোহীরা আঠার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করে তার নেতৃত্ব দিল জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক সেনাপতিকে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে থাকায় ইংলণ্ডের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে ওঠে। ১৭৮৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভার্সাই-এর সন্ধিতে ইংলণ্ড তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। স্বাধীনতা লাভের পর তেরটি উপনিবেশ মিলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলল।

জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকাবাসীদের সাফল্যের কারণ

ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। তারা যে শক্তি সঞ্চয় করে ইংরাজদের কোনদিন পরাস্ত করতে পারবে তা ছিল তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর। তাই যুদ্ধের জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন তা তাঁরা আদৌ অনুভব করেননি।

দ্বিতীয়ত, মাতৃভমি থেকে আমেরিকার বিরাট ব্যবধান হেতু ইংরাজ সেনাপতিরা নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে লাগলেন। এই দূরত্বের ফলে মাতৃভূমির সঙ্গে সংযোগ ও সরবরাহ রক্ষা করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

এছাড়া ইংরাজ সেনাপতিদের বিচক্ষণতার অভাব বহুক্ষেত্রে ঔপ-নিবেশিকদের জয়লাভের সহায়ক হয়েছিল। বিদ্রোহীদের পক্ষে ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ডের যোগদান নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের পথ অনেক সুগম করে দিয়েছিল। ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতালাভের উৎসাহ ছিল অসীম। দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত, স্বাধীনতালাভে কৃতসঙ্কল্প ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড নির্ভর করেছিল

বেতনভুক জার্মান সৈন্যের ওপর। এটাও ইংরাজদের পরাজয়ের একটা বড় কারণ। সর্বোপরি জর্জ ওয়াশিংটনের সুদক্ষ নেতৃত্ব, কর্মক্ষমতা, দূরদৃষ্টি ও অদম্য সাহস ঔপনিবেশিকদের মনে এক গভীর প্রেরণার সৃষ্টি করে তাদের সাফল্যের পথে পরিচালিত করেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প বিপ্লব

ভূমিকা

শিল্প বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব মানুষের কাজকর্ম, যানবাহন ও জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। শিল্পবিপ্লব একদিনে কোন আকস্মিক কারণে হয়নি। এই বিপ্লব এসেছে ধীরে ধীরে—অনেকদিন ধরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে এই বিপ্লবের সূচনা দেখা দেয় এবং ক্রমে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্পবিপ্লবের কারণ

রানী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষদিকে দুঃসাহসী ইংরাজ নাবিকেরা সমুদ্র জয় করে ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। তখন থেকে পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ইংলণ্ডে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূভাগের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণের জন্যে অল্প সময়ে প্রচুর পণ্য উৎপাদন করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ব্যবসায়ীদের এই সমস্যার সমাধান করতে বিজ্ঞান এগিয়ে এল। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে বন্দী করে কাজে লাগাল। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস নব আবিষ্কৃত যন্ত্রে অতি অল্প আয়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে লাগল। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের নামই শিল্প-বিপ্লব।

বয়নশিল্পের উন্নতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকজন ইংরাজ অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করবার চেষ্টা করতে থাকেন। ল্যাঙ্কা-শায়ারের জন কে নামে এক ব্যক্তি যন্ত্রচালিত মাকু উদ্ভাবন করে তাঁতীদের অল্প সময়ে প্রচর বস্ত্র উৎপাদন করবার সুবিধা করে দেন। কিন্তু যন্ত্রচালিত

তাঁতে যত তাড়াতাড়ি কাপড় বোনা যেত, তাঁতীরা তত তাড়াতাড়ি সূতো কেটে জোগাতে পারত না। হারগ্রীভস নামে এক ব্যক্তি সূতাকাটা
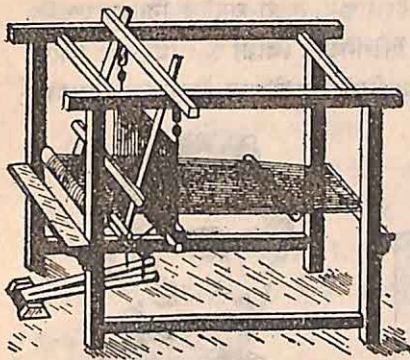
হস্তচালিত তাঁত
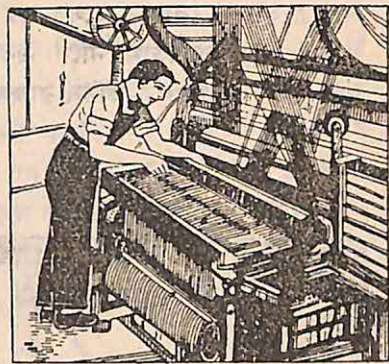
যন্ত্রচালিত তাঁত

যন্ত্র (স্পিনিং জেনি) আবিষ্কার করে এই সমস্যার সমাধান করেন। পরে আর্করাইট আরও উন্নত ধরনের সূতাকাটা যন্ত্র আবিষ্কার করে ইংলণ্ডের বয়নশিল্পে যুগান্তর এনে দেন। এতদিন জলস্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই যন্ত্রগুলিকে চালান হ'ত। কিন্তু জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করে শিল্পজগতে এক বিপ্লব এনে দিলেন।

জেম্‌স্ ওয়াট

কয়লা ও লৌহশিল্পের উন্নতি

ওয়াট সাহেবের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জন্য এখন দরকার পড়ল কয়লা ও লোহার। কাজেই বাষ্পীয় শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কয়লা, লোহা এবং ইস্পাত শিল্পেরও উন্নতি হতে লাগল। আগে কাঠকয়লা দিয়ে লোহা গালাই করা হ'ত। কিন্তু ক্রমশঃ কাঠ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার জন্যে কাঠের বদলে কোক কয়লা ব্যবহৃত হতে লাগল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে কয়লা খনিগুলিরও শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। আগে ইংলণ্ডের কয়লা খনিগুলিতে কাজের সময় প্রাণহানির আশঙ্কা বেশি ছিল। স্যার হাম্‌ফ্রী ডেভী সেফ্‌টি ল্যাম্প আবিষ্কার করে খনির কাজকে অনেক নিরাপদ করে তুললেন।

রাস্তা-ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থারও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল। রোমান যুগের পর ইংলণ্ডের রাস্তা-ঘাটের বিশেষ উন্নতি হয়নি। ম্যাকঅ্যাডাম নামে এক ইঞ্জিনিয়ার খোয়া ও পাথরকুচি পেতে তার ওপর পীচ ঢেলে কঠিন রাজপথ নির্মাণের উপায় উদ্ভাবন করলেন।
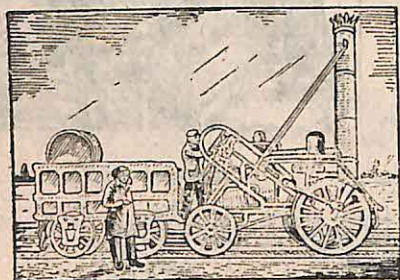
যন্ত্রচালিত ইঞ্জিন

স্টিফেনসন

এইসব রাজপথে ভারী গাড়ীর চলাচল সহজ হ'ল। এরপর জর্জ স্টিভেন্সন যখন গাড়ী টানার জন্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন তখন যাতায়াত ব্যবস্থায়ও যগান্তর ঘটল। ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেলপথ নির্মিত হ'ল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন ক্রমে জাহাজেও ব্যবহার করা হতে থাকে।

কৃষির উন্নতি

বিজ্ঞানের কল্যাণে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী অতঃপর কৃষিকার্যের দিকেও নিপতিত হ'ল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংলণ্ডের কৃষকেরা মান্ধাতার আমলের প্রাচীন প্রথায় চাষ-আবাদ করত। তারা মনে করত যে, একই জমিতে পর পর দুবছরের বেশি ফসল ফলালে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। তাই তারা প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ জমি চাষ না করে ফেলে রাখত। টাউন-শেণ্ড নামে একজন বড় জমিদার দেখালেন যে, কোন জমিতে একটা ফসল তোলবার পর সেখানে শালগম বা গাজরের চাষ করলে সে জমির উর্বরতা কমে না, বরং তারপর সেই জমিতে যব চাষ করলে চমৎকার ফসল হয়। ক্রমে টাউনশেণ্ডের পদ্ধতিতে চাষ করে চাষীরা উপকৃত

হ'ল। এতে তাদের জমির ফসল বৃদ্ধি পেল এবং কোন জমিই আর পতিত রাখবার প্রয়োজন রইল না। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

আগে চাষীরা চাষের কাজ সব হাত দিয়েই করত। এতে তাদের পরিশ্রম এবং সময় দুই-ই বেশি লাগত। টুল নামে এক ইংরাজ চাষের জন্য এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করা, বীজ বোনা এবং বীজ ঢেকে দেওয়া—এ সব কাজই এক সঙ্গে করা যেত। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করতে হলে বড় জমির প্রয়োজন হয়। তাই ছোট ছোট জমি একত্র করে চাষের জন্য বড় জমি তৈরী করা হ'ল। এই-ভাবে কৃষি ব্যবস্থায় আদিম যুগের অবসান হয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন হ'ল।

কৃষিকার্যের উন্নতির সঙ্গে গরু, ভেড়া প্রভৃতির উন্নতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বেকওয়েল নামে একজন সাহেব বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভেড়ার এত উন্নতি করলেন যে, তাঁর এক একটি ভেড়ার ওজন প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেল। আর একজন সাহেব বিজ্ঞানের সাহায্যে চেষ্টা করে ছোট শিংওয়ালা এক জাতের গরু সৃষ্টি করলেন যা আজও জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে। এই জাতের গরু যত্ন করলে দিনে ৩০ কেজি পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে, মানুষের ভোগের উপকরণ বেড়েছে। এক কথায় বলতে গেলে মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডবাসীরা তাদের শিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি আহরণ করেছিল। সেই সব ধনী ব্যবসাদাররা বড় বড় কারখানা স্থাপন করে পণ্য উৎপাদন একচেটে করে নিল। বাড়তি পণ্য বিক্রীর জন্যে তারা নতুন নতুন বাজারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। উপ-নিবেশের বাজার আয়ত্ত করতে হলে এবং নিজের দেশে উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করতে হলে শাসন ব্যাপারে নিজেদের কর্তৃত্ব রাখতে হয়। তাই ধনীরা শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক কাঠামো মারফত সরকার করায়ত্ত করল। একেই বলে ধনতন্ত্র।

শিল্পবিপ্লব শুধু ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ধীরে ধীরে ইওরোপের সর্বত্র এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই তখন নিজের দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির জন্যে বিদেশের বাজার খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিল্পবিজ্ঞানে এশিয়া

ও আফ্রিকার দেশগুলি ছিল তখন অনগ্রসর। তাই ঐসব দেশে রাজ-নৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারলে নিজেদের পণ্য বিক্রীর সুযোগ মিলবে এই আশায় ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে উঠ্‌ল। আমরা দেখেছি এই সূত্র ধরেই ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি দেশের মধ্যে উপস্থিত হল শ্রেণী বিদ্বেষ। কলকারখানা কারিগরদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। এতদিন কারিগর ছিল স্বাধীন। সে যখন খুশী কাজ করত, যখন খুশী বিশ্রাম করত। সে গোটা জিনিসটা নিজে হাতে গড়ত আর তা বেচে যা লাভ হত তা সম্পূর্ণ নিজেই ভোগ করত। এখন সে হ'ল কারখানার মজুর, মালিকের বেতনভোগী ভৃত্য। তাকে পশুর মত খাটতে হয়। কোন-রকম হাতের নৈপুণ্য দেখাবার তার সুযোগ নেই। যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে মজুরও যন্ত্রের মতই কাজ করে যায়।

এই নতুন প্রথা সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিল। এতদিন সভ্যতা ছিল গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক। এখন সভ্যতা হ'ল শহরে ও শিল্প-ভিত্তিক। শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রামের কুটীর শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই গ্রামের মানুষ কাজের খোঁজে শহরে এসে ভীড় করতে লাগল। কার-খানার মজুরেরা দিনে বার তের ঘন্টা কাজ করে। তাদের মধ্যে মেয়েরা ও শিশুরাও আছে। তাদের চাকুরিরও কোনরকম স্থায়িত্ব ছিল না। যখন তখন মালিকের খুশীমত তাদের চাকুরী যেত অথবা বেতন কাটা হ'ত। মজুরেরা থাকে বস্তিতে। সেগুলি ছিল যেমন নোংরা, তেমনি আলোবাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর। এরই মধ্যে হাজার হাজার শ্রমিক দিন কাটাতে বাধ্য হ'ত। ফলে তাদের স্বাস্থ্য, রুচি ও সুনীতি সবই ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। একদিকে এই দারিদ্র্য, অন্যদিকে কারখানার মুষ্টিমেয় মালিক লাভের মোটা অংশ পেয়ে দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। শিল্প বিস্তারের ফলে দেশের যা ধনসম্পদ বাড়ল তা সবই জমা হতে লাগল ঐ মুষ্টিমেয় ধনীদের ভাণ্ডারে।

ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার মালিক ও শ্রমিকের শ্রেণীবিরোধ শুরু হয়ে গেল। উৎপীড়িত শ্রমিকেরা ক্রমশঃ কারখানার জীবন ও কারখানার মালিকদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে। কারখানার কুব্যবস্থাগুলির প্রতি ক্রমে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সরকারী চেষ্টায় কারখানা আইন পাশ করে শ্রমিকদের নানারকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক দেশে কারখানাগুলিকে

রাষ্ট্রের অধীনে এনেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা চলছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার সমাধান কি করে করা যায় এটি এখনকার একটি মস্ত বড় সমস্যা। শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের উদ্ভব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পবিপ্লবের কুফল যতই থাকুক না কেন, একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃতির ওপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করে মানুষ আজ অশেষ সম্পদের অধিকারী হয়েছে। সে সম্পদ সমগ্র সমাজের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারলে মানবসভ্যতা নিঃসন্দেহে এক নতুন রূপ গ্রহণ করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লব
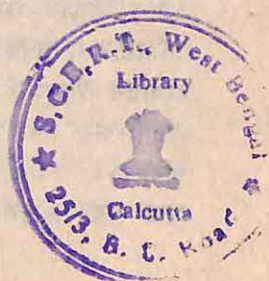
প্রাক্-বিপ্লব চিন্তাধারা

বহুকাল থেকে ফ্রান্সে বুর্বোঁ বংশের রাজারা দেশ শাসন করতেন। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের মত তাঁরাও নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত প্রজাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। বুর্বোঁ রাজারা একদিকে যেমন স্বেচ্ছাচারী অপরদিকে তেমনি বিলাসপরায়ণ ছিলেন। শুধু ফ্রান্স নয়, ইওরোপের প্রায় সর্বত্রই তখন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশের সামরিক শক্তি ছিল রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। নাগরিক অধিকার-স্বরূপ প্রজাদের কোন দাবি রাজা স্বীকার করতেন না। সর্বত্র বহাল ছিল সেই পুরাণো সামন্তপ্রথা। সরকারী ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর হাতে। তাদের অধীনে চাষীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। যতরকম করের বোঝা সব তাদের ওপরেই চাপান হ'ত। ভূমি-দাসের মত তারা শুধু প্রভুর তাঁবেদারি করত। যাদের কর দেবার সামর্থ্য আছে তাদেরই খাজনা মকুব করা হত।

ফরাসী দার্শনিকগণ

কয়েক শ' বছর ধরে ফ্রান্সের বুকে যে অন্যায় ও বৈষম্য জমে উঠেছিল একদল চিন্তাশীল লেখক তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। ধারালো যুক্তি দিয়ে আবেগময়ী ভাষায় তাঁরা স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করলেন। এইভাবে সবরকম কুসংস্কার ও কুশাসনের মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করে যেতে লাগলেন। এ যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেস্কু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রুশো

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে জনসাধারণের মনে যিনি সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর নাম রুশো। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। নাগরিক জীবনের বিকার ও বিলাসিতার পাশে তিনি তুলে ধরলেন সরল গ্রাম্যজীবনের বলিষ্ঠতা ও পবিত্রতা। তিনি বললেন যে, প্রজাসাধারণের সমবেত ইচ্ছা এবং সমর্থন হচ্ছে রাজতন্ত্রের ভিত্তি। "সামাজিক চুক্তি" (Social contract)

নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের দাবি প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় জনসাধারণের এক চুক্তির ওপর। এই চুক্তি অনুসারে জনসাধারণের নির্দেশে সরকার দেশশাসন করবেন। আইনের অধিকার থাকবে জনসাধারণের হাতে। চুক্তিভঙ্গ করলে সরকারকে সরিয়ে তারা নতুন সরকার গঠন করবে। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার—এখানে প্রভু ও দাসের সম্পর্ক নেই। এইভাবে রুশো রাজতন্ত্র ও পুরাণো ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত হানলেন।

ভলতেয়ার

মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সবরকমের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করাই ছিল ভলতেয়ারের জীবনের ব্রত। যেখানেই তিনি দেখেছেন ধর্মের নামে জুলুম অথবা দেশ শাসনের নামে স্বেচ্ছাচার চলছে সেখানেই তিনি কলম ধরেছেন। তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের আঘাতে তিনি দাম্ভিক অত্যাচারীকে জর্জরিত করতেন। ফ্রান্সের ঘূণধরা আইন, বিচার পদ্ধতি, দণ্ডবিধি, চার্চের ধর্মান্ধতা—কোন কিছুকেই তিনি অব্যাহতি দেন নি। নানা যুক্তির সাহায্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করে ভলতেয়ার বিপ্লবাত্মক ভূমিকা গ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন। তাঁর লেখা পড়ে জনসাধারণের মন থেকে রাজা ও পুরোহিতদের ওপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঘুচে গেল। এইভাবে তাঁর রচনা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগল।

মন্টেস্কু

মন্টেস্কু ছিলেন জন লকের দার্শনিক চিন্তাধারার একজন উত্তর-সাধক। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ফরাসীদের সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে গিয়েছেন। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, ভার্সাই রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা ও যাজকশ্রেণীর দুর্নীতিকে তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম আইনের সত্তা (Spirit of Lodge)। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল যে, শাসকের খেয়ালখুশীদ্বারা আইন তৈরী হতে পারে না। সমাজের মধ্যে প্রাকৃতিক, ধর্মীয়, আর্থিক ইত্যাদি নানাবিধ প্রভাবের আওতায় থেকে মানুষ পরস্পর যে সম্বন্ধ রচনা করে তাকেই বলে আইন। আইনের কাজ মানুষের সহজাত সম্বন্ধকে রক্ষা করা, শাসন ও উৎপীড়ন করা নয়। তিনি বললেন, স্বেচ্ছাচারী শাসন থেকে ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করতে হলে শাসন, আইন ও বিচার—এই তিন বিভাগকে পৃথক্ রাখা

উচিত। আইন সভা আইন প্রণয়ন করবে, বিচার সভা আইনের ব্যাখ্যা করবে এবং সরকার সেই অনুসারে আইন প্রয়োগ করবে।

এইসব চিন্তানায়কদের মতবাদ সমসাময়িক ফরাসী সমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতির। তদানীন্তন রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দোষত্রুটীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফরাসী দার্শনিকেরা বিপ্লবের এই মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও তাহার বিস্তার

ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল তিনটি প্রধান কারণ—(ক) রাজার স্বেচ্ছাচারিতা; (খ) সমাজের শ্রেণীবৈষম্য এবং (গ) করভারে জর্জরিত কৃষক সম্প্রদায়ের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র

ফরাসী দেশের রাজারা দেবদত্ত অধিকার বলে নিজেদের খুশীখেয়ালমত দেশ শাসন করতেন। কেউ কোন প্রতিবাদ করলে বিনাবিচারে তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হ'ত। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের মত ফরাসী দেশেও তখন একটা প্রতিনিধি সভা ছিল। কিন্তু ফরাসী রাজারা এতই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন যে, সেই প্রতিনিধি সভার পরামর্শ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না তাঁরা। প্রজাদের কল্যাণের দিকেও তাঁদের কোন নজর ছিল না। তাছাড়া চতুর্দশ লুইয়ের পরবর্তী রাজারা সকলেই ছিলেন অপদার্থ। রাজকার্য বিশেষ দেখতেনই না। সব সময়ে বড় বড় জমিদার ও মোসাহেবদের নিয়ে বিলাসব্যসনে মেতে থাকতেন। এইসব স্বার্থপর, লোভী ও অপদার্থ পার্শ্বচরেরাই ছিল রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র কখনও জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে না। তাই রাজ্যের সর্বত্র জনসাধারণের মনে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হতে শুরু করে।

শ্রেণীবৈষম্য ও শোষিত কৃষকসম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ

ফরাসী সমাজে রাজার পরেই ছিল জমিদার ও যাজকশ্রেণীর লোকদের স্থান। বড় বড় যাজকেরাও জমিদারদের মত বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। ধর্মকর্মের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে অর্থ উপার্জন করাই ছিল তাঁদের

একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশে যখন সামন্ত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তখন অভিজাত সম্প্রদায়কে কতকগুলি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হ'ত। সেই দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে তাঁরা কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু পরে রাজার অধীনে শাসনক্ষমতা যখন কেন্দ্রীভূত হ'ল তখন আর তাঁদের সে দায়িত্ব রইল না। কিন্তু মজা এই, কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চলে গেলেও তার বিনিময়ে তাঁরা যে বিশেষ অধিকার ভোগ করেছিলেন তা তাঁরা ত্যাগ করলেন না। এই অধিকার বলে অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষেতখামারে চাষীদের বেগার খাটতে বাধ্য করতেন। অভিজাতদের প্রমোদ শিকারে পাছে অসুবিধা হয়, এজন্য চাষীরা তাদের জমিতে বেড়া দিতে পারত না। দেশের বেশীরভাগ জমিজমা ছিল অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর অধিকারে। রাজসভা ও সৈন্যবিভাগের বড় বড় চাকুরিতেও তাঁদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু বিস্তৃত জমি-জমা ও ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও তাঁরা রাজাকে কোনরকম খাজনা দিতেন না। অথচ দেশ শাসনের আইন-কানুনগুলি সবই তাঁদের স্বার্থ বজায় রেখেই তৈরী করা হত।

ফরাসী রাজসভার যতরকম অপচয় ও বিলাস-ব্যসনের খরচ জোগানোর গুরুভার সবই গিয়ে পড়েছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত, কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকেদের ওপর। মধ্যবিত্তদের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল বলা চলে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতেও এরা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু শাসন ব্যাপারে এদের কোন অধিকার না থাকাতে এরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পের উন্নতি না হওয়ায় শ্রমিক ও শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই ছিল বেকার। এই কারণে ফ্রান্সের শহরে শহরে তখন বহু ক্ষুধার্ত গরীব বাস করত। সব-চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের। অথচ সারা ফ্রান্সের আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সওয়া দু' কোটি লোক হ'ল চাষী। এই চাষীদের তিন দফা কর দিতে হ'ত—প্রথমতঃ তার জমিদারকে, দ্বিতীয়তঃ তার এলাকার ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে, এবং তৃতীয়তঃ রাজাকে। কৃষকের জমি থেকে যা আয় হ'ত তার শতকরা আশীভাগ চলে যেত এই তিন দফা কর মেটাতে। অবশিষ্ট শতকরা কুড়িভাগ দিয়ে চাষী অনশনে-অর্ধাশনে কোনরকমে দিন কাটাত। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের এই অন্যায় অত্যাচার আর শোষণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ আর কতদিন নীরবে সহ্য করতে পারে? ঠিক এই সময়েই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী ফরাসী সৈনিকেরা দেশে ফিরে এসে দেশবাসীকে নতুন মুক্তির বাণী শোনাতে শুরু করল। সেখানে তারা মুক্তিমন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ

দেখে ফ্রান্সেও তা পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কাজেই দেশের নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা তখন একটা বড় রকমের বিপ্লবের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল।

বিপ্লবের পূর্বাভাষ

তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ষোড়শ লুই। তাঁর পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। ব্যয়বহুল রাজ দরবার, বৈদেশিক যুদ্ধ এবং সরকারের অক্ষমতা দেশকে ক্রমেই ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলল। রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এই দুর্দিনে দেশের সকল প্রজাই যদি রাজকর দিত তাহলে অবস্থা হয়ত' এতটা সঙ্কটজনক হ'ত না। কিন্তু দেশের চরম দুর্দিনেও অভিজাত সম্প্রদায় কর দিতে রাজী হ'ল না। সুতরাং ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হ'ল। রাজা তখন দেশের সাধারণ রাষ্ট্রসভা ডাকতে বাধ্য হলেন। এই রাষ্ট্রসভা ছিল অনেকটা ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের মত। এর আগে একশ' পঁচাত্তর বছরের মধ্যে ফরাসী দেশের এই রাষ্ট্রসভা একবারও ডাকা হয়নি। রাষ্ট্রসভার নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশে উত্তেজনার জোয়ার বয়ে গেল। যাজকদের মধ্য থেকে ৩০০, সামন্ত ও জমিদারদের মধ্য থেকে ৩০০ এবং মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির মধ্য থেকে ৬০০—এই মোট ১২০০ প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। এই সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দেশের দুর্দশার কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করলেন। অধিবেশনের প্রথমেই জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দাবি করলেন যে, অভিজাত, ধর্মযাজক এবং সাধারণ প্রতিনিধিরা সকলেই একত্রে অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের আলাদা ভোট থাকবে। কিন্তু অভিজাত ও ধর্মযাজক প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তখন রাজার আদেশে সভাগৃহ বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। মীরাবো নামে একজন অভিজাত প্রতিনিধি জনসাধারণের পক্ষ হয়ে রাজার এই আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিরা নিকটবর্তী এক টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে তাঁরা নিরস্ত হবেন না। রাজাকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হ'ল। এইভাবে জনসাধারণের প্রথম জয় সূচিত হ'ল। তারা সাধারণ রাষ্ট্রসভাকে জাতীয় সভা বলে ঘোষণা করল।

বিপ্লবের সূচনা ও বাস্তিল দুর্গের পতন

জনসাধারণের এই ক্ষমতা লাভ লুই সহ্য করতে পারলেন না। জাতীয় সভা ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। এই

ঘটনায় প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা বিদ্রোহী হয়ে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করল। এই দুর্গটি ছিল ফ্রান্সের লোকদের কাছে রাজশক্তির প্রতীক। রাজার অপ্রীতিভাজন লোকদের

বাস্তিল দুর্গের পতন

বিনা বিচারে সেখানে বন্দী করে রাখা হ'ত। যারা একবার সেখানে প্রবেশ করত তারা কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসত না। বিদ্রোহীরা এই দুর্গটিকে অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলল এবং বন্দীদের মুক্তি দিল। বাস্তিল দুর্গের পতনের দিনটি (১৪ই জুলাই, ১৭৮৯) আজও ফরাসীরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে।

এরপর বিদ্রোহীরা প্যারিসে এক নতুন পৌরশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলল এবং তার নাম দিল "কমিউন"। একটি জাতীয় রক্ষীদল গঠন করে তারা লাফায়েৎ নামে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিককে তার অধিনায়ক করে দিল। তখন থেকে বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হ'ল।

কৃষক অভ্যুত্থান

প্যারিসের মত ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গাতেও ক্রমে জাতীয় রক্ষীদল গড়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াল। নিজ নিজ এলাকায় জড় হয়ে তারা জমিদারদের প্রাসাদ ও দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলল, তাঁদের সম্পত্তির দলিলপত্র সব পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। এই সময়ে জাতীয় সভার এক অধিবেশনে অভিজাত সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় জমির ওপর নিজেদের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দেখে ফ্রান্সেও তা পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কাজেই দেশের নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা তখন একটা বড় রকমের বিপ্লবের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল।

বিপ্লবের পূর্বাভাষ

তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ষোড়শ লুই। তাঁর পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। ব্যয়বহুল রাজ দরবার, বৈদেশিক যুদ্ধ এবং সরকারের অক্ষমতা দেশকে ক্রমেই ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলল। রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এই দুর্দিনে দেশের সকল প্রজাই যদি রাজকর দিত তাহলে অবস্থা হয়ত' এতটা সঙ্কটজনক হ'ত না। কিন্তু দেশের চরম দুর্দিনেও অভিজাত সম্প্রদায় কর দিতে রাজী হ'ল না। সুতরাং ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হ'ল। রাজা তখন দেশের সাধারণ রাষ্ট্রসভা ডাকতে বাধ্য হলেন। এই রাষ্ট্রসভা ছিল অনেকটা ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের মত। এর আগে একশ' পঁচাত্তর বছরের মধ্যে ফরাসী দেশের এই রাষ্ট্রসভা একবারও ডাকা হয়নি। রাষ্ট্রসভার নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশে উত্তেজনার জোয়ার বয়ে গেল। যাজকদের মধ্য থেকে ৩০০, সামন্ত ও জমিদারদের মধ্য থেকে ৩০০ এবং মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির মধ্য থেকে ৬০০—এই মোট ১২০০ প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। এই সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দেশের দুর্দশার কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করলেন। অধিবেশনের প্রথমেই জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দাবি করলেন যে, অভিজাত, ধর্মযাজক এবং সাধারণ প্রতিনিধিরা সকলেই একত্রে অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের আলাদা ভোট থাকবে। কিন্তু অভিজাত ও ধর্মযাজক প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তখন রাজার আদেশে সভাগৃহ বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। মীরাবো নামে একজন অভিজাত প্রতিনিধি জনসাধারণের পক্ষ হয়ে রাজার এই আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিরা নিকটবর্তী এক টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে তাঁরা নিরস্ত হবেন না। রাজাকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হ'ল। এইভাবে জনসাধারণের প্রথম জয় সূচিত হ'ল। তারা সাধারণ রাষ্ট্রসভাকে জাতীয় সভা বলে ঘোষণা করল।

বিপ্লবের সূচনা ও বাস্তিল দুর্গের পতন

জনসাধারণের এই ক্ষমতা লাভ লুই সহ্য করতে পারলেন না। জাতীয় সভা ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। এই

ঘটনায় প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা বিদ্রোহী হয়ে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করল। এই দুর্গটি ছিল ফ্রান্সের লোকদের কাছে রাজশক্তির প্রতীক। রাজার অপ্রীতিভাজন লোকদের

বাস্তিল দুর্গের পতন

বিনা বিচারে সেখানে বন্দী করে রাখা হ'ত। যারা একবার সেখানে প্রবেশ করত তারা কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসত না। বিদ্রোহীরা এই দুর্গটিকে অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলল এবং বন্দীদের মুক্তি দিল। বাস্তিল দুর্গের পতনের দিনটি (১৪ই জুলাই, ১৭৮৯) আজও ফরাসীরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে।

এরপর বিদ্রোহীরা প্যারিসে এক নতুন পৌরশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলল এবং তার নাম দিল "কমিউন"। একটি জাতীয় রক্ষীদল গঠন করে তারা লাফায়েৎ নামে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিককে তার অধিনায়ক করে দিল। তখন থেকে বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হ'ল।

কৃষক অভ্যুত্থান

প্যারিসের মত ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গাতেও ক্রমে জাতীয় রক্ষীদল গড়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াল। নিজ নিজ এলাকায় জড় হয়ে তারা জমিদারদের প্রাসাদ ও দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলল, তাঁদের সম্পত্তির দলিলপত্র সব পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। এই সময়ে জাতীয় সভার এক অধিবেশনে অভিজাত সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় জমির ওপর নিজেদের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

প্যারিসে জাতীয় সভার অধিবেশন ও নতুন শাসন ব্যবস্থা

সেই সময়ে ফ্রান্সে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন একদল ক্ষুধার্ত নরনারী বলপূর্বক রাজাকে সপরিবারে প্যারিসে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সভার সদস্যরাও প্যারিসে এলেন। প্যারিসে জাতীয় সভার অধিবেশনে অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, ভূমিদাস প্রথা, উচ্চ-শ্রেণীর খাজনা মকুব ও চার্চের কর তুলে দেওয়া হ'ল। জাতীয় সভার সদস্যরা সমস্ত মানবজাতির মৌলিক অধিকার সম্পর্কে একটি ঘোষণা-পত্র প্রস্তুত করেন। এতে মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। জাতীয় পরিষদ এই সময় এক নতুন শাসনতন্ত্রও রচনা করে। এতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। রাজার আর নিজের ইচ্ছামত রাজ্য শাসনের ক্ষমতা রইল না। ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত সম্পত্তিও এই সময়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

ষোড়শ লুইর কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থা পছন্দ হ'ল না। বিদেশীদের সাহায্যে তাঁর পূর্বের ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে তিনি সপরিবারে প্যারিস ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সীমান্তে এসে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে আবার জোর করে প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল।

বিপ্লবীদের সঙ্গে ইওরোপের রাজাদের যুদ্ধ ও রাজতন্ত্রের অবসান

ফ্রান্সে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখে ইওরোপের বড় বড় রাজারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লব শুরু হবার পর ফ্রান্সের অভিজাত পরিবারের বহু লোক ইওরোপের অন্যান্য রাজসভায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ফ্রান্সের যুদ্ধের জন্য ইওরোপের রাজাদের উত্তেজিত করতে থাকেন। রাজপক্ষের যেসব লোক তখনও ফ্রান্সে ছিল তাঁরাও গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ফ্রান্সের রাণী মেরী এন্টোনিয়েট ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভগ্নী। তাই অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রাশিয়ার রাজার সঙ্গে একত্র হয়ে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা লুইকে বিপ্লবীদের হাত থেকে মুক্ত করে ফ্রান্সের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। ফলে এঁদের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথমে বিপ্লবীরাই হেরে যায়। তারা মনে করল যে, নিশ্চয়ই বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে লুইর কোন যোগাযোগ আছে। তাই প্যারিসের উত্তেজিত জনতা রাজপ্রাসাদ দখল করে রাজা ও রানীকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। তখন দেশের শাসনতন্ত্র কিরকম হবে তা স্থির করবার জন্যে একটা নতুন প্রতিনিধিসভা (Convention) আহ্বান করা হয়। এঁরা রাজাকে পদচ্যুত করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। এইভাবে ফরাসীদেশে তখনকার মত রাজতন্ত্রের অবসান হ'ল।

ফ্রান্সের সেনাবিভাগে সেই সময়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এইজন্য প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সেনাপতিরা মনে করেছিলেন যে, তাঁরা অনায়াসে ফ্রান্সে প্রবেশ করে লুইকে পুনরায় সিংহাসনে বসাতে পারবেন। কিন্তু বিদেশীদের আক্রমণের ফলে ফরাসীদের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ রক্ষার জন্য ফ্রান্সের নানা জায়গা থেকে তরুণেরা এসে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সের আকাশে বাতাসে তখন এক অভিনব সঙ্গীত শোনা যেত। এই বিখ্যাত সঙ্গীতটি 'মার্সেলস্' নামে পরিচিত। এই সঙ্গীতের তালে তালে ফরাসী সৈন্যবাহিনী অমিতবিক্রমে বিদেশী শত্রুদের আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিত। ভালমির যুদ্ধে বিপ্লবী ফরাসী সৈনেরা অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের অপরাজেয় শক্তি প্রমাণিত করেছিল।

সন্ত্রাসের রাজত্ব

রাজার প্যারিস থেকে পলায়নের চেষ্টার পর থেকেই ফ্রান্সে জ্যাকোবিন নামে চরমপন্থী বিপ্লবীদের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেশের শাসন পরিচালনার ভারও চলে গেল ঐ চরমপন্থীদের হাতে। চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে রোবস্পিয়ার ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনিই দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। ফরাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লুইর প্রাণদণ্ড হল। কিছুদিন পরে রানীরও ঐ
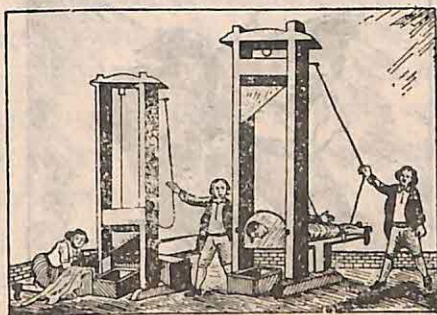
গিলোটিন

দশা হয়। জ্যাকোবিনরা বিচারের প্রহসন করে দু হাজারেরও বেশি লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। তাদের নেতৃত্বে অদম্য উৎসাহ নিয়ে ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশের বহু রণাঙ্গনে জয়লাভ করে এবং প্রায় সর্বত্র ফরাসী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে নিজেদের মধ্যে কলহ এবং দলাদলিতে চরমপন্থী

দল দুর্বল হয়ে পড়ে। রোবস্‌পিয়ার এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেকেই প্রাণ হারালেন। সন্ত্রাস রাজত্বেরও অবসান হল।

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান

রোবস্‌পিয়ারের পতনের পর দেশ শাসনের ভার পড়ল পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত এক নির্দেশক সভার (Directory) ওপর। কিন্তু এঁরা দেশের মধ্যে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। বিদেশীদের সঙ্গে তখনও যে যুদ্ধ চলছিল তাতে ফরাসীরা হেরে গেল। সেই সুযোগে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে একজন অসীম প্রতিভাশালী সেনানায়ক দেশ শাসনের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। প্রথম থেকেই তিনি ফরাসী জাতীয় আদর্শের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তুলোঁ থেকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করে তিনি আপন সামরিক দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৭৯৫ সালে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণ থেকে ফরাসী জাতীয় সভাকে তিনি রক্ষা

নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের বিজয় অভিযান

করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সেনাদের সহায়তায় তিনি দেশের পর দেশ জয় করে ফরাসীদের মনে বিজয় গৌরবের উদ্দীপনা এনে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইওরোপে এক শক্তি জোট গড়ে ওঠে। নেপোলিয়ন যুদ্ধ করে সেই শক্তিজোট ভেঙ্গে দেওয়ায় স্বদেশে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেল। এরপর তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পনের বছর ধরে তিনি প্রায় সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। রাজত্বের শেষের দিকে স্পেন, জার্মানী ও রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন তাঁকে চূড়ান্ত-ভাবে পরাজিত করেন।

নেপোলিয়নের সংস্কার

গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর প্রতি নেপোলিয়নের আদৌ কোন আস্থা ছিল না। বুর্বোঁ বংশীয় রাজাদের মত তিনিও ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু বিপ্লবের প্রথম দিকে ফ্রান্সে যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়েছিল, নেপোলিয়ন সেগুলিকে আইনের স্বীকৃতি দিয়ে স্থায়ী করে-ছিলেন। এর ফলে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপিত হয়েছিল। রাজপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে যেসব আইনকানুন ছিল সেগুলিও তিনি তুলে দেন এবং সকলশ্রেণীর লোককে গুণানুসারে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করবার অধিকার প্রদান করেন। নেপোলিয়নের এই উদার নীতির জন্য ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি আবার ফিরে এসেছিল। তিনি দেশের পথঘাট সংস্কার, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজ করে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের রচিত আইনগুলি বহু দেশে গৃহীত হয়েছিল। সামরিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নেপো-লিয়নের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের স্বাধীনতার স্থান ছিল না বটে, কিন্তু বিপ্লব-প্রসূত সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে বিপ্লবের সন্তান।

ইওরোপের গণজাগরণ

নেপোলিয়ন যখন পর্তুগাল ও স্পেন আক্রমণ করেন তখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনে এক গণজাগরণ শুরু হয়ে যায়। ফ্রান্সের প্রতি শত্রুতাবশতঃ ইংলণ্ড ও পর্তুগাল স্পেনকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। এইভাবে ফ্রান্স উপদ্বীপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। স্থল-যুদ্ধে অপরাজেয় ফরাসী বাহিনী স্পেনে ও পর্তুগালে প্রথম পরাজয়ের

গৌরব শীর্ষে নেপোলিয়নের
সাম্রাজ্য (১৮০৭)
ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন
ফ্রান্সের অনুগত
ফ্রান্সের মিত্র
স্বাধীন
আয়ার ল্যাণ্ড
গ্রেট বৃটেন
ডেনমার্ক
আটলান্টিক মহাসাগর
ফ্রান্স
স্পেন
প্রাশিয়া
অস্ট্রিয়া
রাইন কনফেডারেশন
সুইস প্রজাতন্ত্র
ইতালী রাজ্য
নেপলস রাজ্য
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
সিসিলি
ভূমধ্য সাগর
আফ্রিকা
কৃষ্ণ সাগর
তুর্কী সাম্রাজ্য

সম্মুখীন হ'ল। বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী দিয়ে কখনও জাতীয় আন্দোলন প্রতিরোধ করা যায় না। তাই স্পেন ও পর্তুগালের জাতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের বেতনভোগী সৈন্যদল কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে নি। ক্রমে জাতীয় প্রতিরোধের এই নতুনভাব জার্মানীতে প্রবেশ করল। স্পেনে নেপোলিয়নের পরাজয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা বহুলাংশে হ্রাস করে দিয়েছিল। স্পেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ শুরু হলে স্পেন থেকে আরম্ভ করে রাশিয়া পর্যন্ত এক বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে নেপোলিয়ন-বিরোধী এক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী অবদান

ফরাসী বিপ্লব একটি পুরাণো যুগের অবসান এবং নতুন যুগের অরুণোদয় সূচিত করেছিল। জীর্ণ পুরাণো যুগের স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধার দিনগুলি আর কোনদিন ফিরে আসেনি। নেপোলিয়নের পতনের পর ফরাসী রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সামন্ত আমলের দাসত্ব পুনরুজ্জীবিত হ'ল না। এইভাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে পুরাণো সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রবিধানের ভিত্তি নড়ে গেল। ফ্রান্সের মত স্বেচ্ছাচার ও সমাজ-বৈষম্য অল্পবিস্তর ইওরোপের প্রায় সব দেশেই তখন প্রচলিত ছিল। তাই দেশ দেশান্তরে ফ্রান্সের বিপ্লবী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটতে বিলম্ব হ'ল না। নেপোলিয়নের রাজত্বে ফ্রান্সে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাধা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে ইওরোপের জাতিগুলি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের পতনের পর সর্বত্র পুরাণো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হলেও তা বেশিদিন টেঁকেনি। শীঘ্রই বিপ্লবী আদর্শ আবার পুনর্জীবন লাভ করল এবং গণ আন্দোলনের চাপে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটল। ক্রমে গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক নতুন ইওরোপের জন্ম হয়।

নবম অধ্যায়

ইওরোপের পুনর্গঠন

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি

নেপোলিয়নের পতনের পর বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে গেল তখন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুনর্বিন্যাস এক বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের সম্রাট ও রাজনীতিবিদেরা ১৮১৫ সালে ভিয়েনাতে এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়াই ছিল প্রধান। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত কূটনীতিবিদ্‌রা সকলেই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। এঁদের কাছে জাতীয়তা, স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি প্রগতিশীল চেতনা ছিল অবৈধ ও নিষিদ্ধ। তাই তাঁরা ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সমাধি রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইও-রোপের পুনর্গঠনের জন্য তাঁরা স্থির করলেন যে ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসরণ করা হবে। এই নীতি প্রয়োগের দ্বারা সম্মেলনের কর্ণধারগণ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। অর্থাৎ যে সমস্ত রাজবংশের রাজত্ব ফরাসীরা অধিকার করে নিয়েছিল তা আবার সেই সব রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নেপোলিয়নের আক্রমণে ইওরোপে রাজতন্ত্র, সামন্ত প্রথা এবং আনুষঙ্গিক বহু পুরানো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। সমবেত রাষ্ট্রনায়করা সর্বত্র সেই জীর্ণ, প্রাচীন বিধানকে আবার খাড়া করতে তৎপর হলেন। এইভাবে তাঁরা কালের গতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

পবিত্র চুক্তি

ভিয়েনা সিদ্ধান্তগুলিকে স্থায়িভাবে কার্যকর করাই ছিল সেযুগের রাজনীতিবিদ্‌দের সামনে প্রধান সমস্যা। পরাজিত ফ্রান্স যে কোন সুযোগে আবার প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হতে পারে, ফরাসী বিপ্লব থেকে উত্থিত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নবীন আদর্শ সমস্ত ইওরোপে আবার ছড়িয়ে পড়তে পারে—এই আশঙ্কা তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সুতরাং ইওরোপের পুনর্বন্টনের কাজ যাতে স্থায়ী হয় সেজন্য একটি শক্তি-

ইউরোপ
১৮১৫
(ভিয়েনার বন্দোবস্ত অনুসারে)
রাশিয়া
প্রাশিয়া
জার্মানী
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরী
ফ্রান্স
স্পেন
ডেনমার্ক
গ্রেট ব্রিটেন
সুইজারল্যাণ্ড
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
কৃষ্ণ সাগর
পারস্য
আফ্রিকা
ভূ মধ্য সাগর
আড্রিয়াটিক
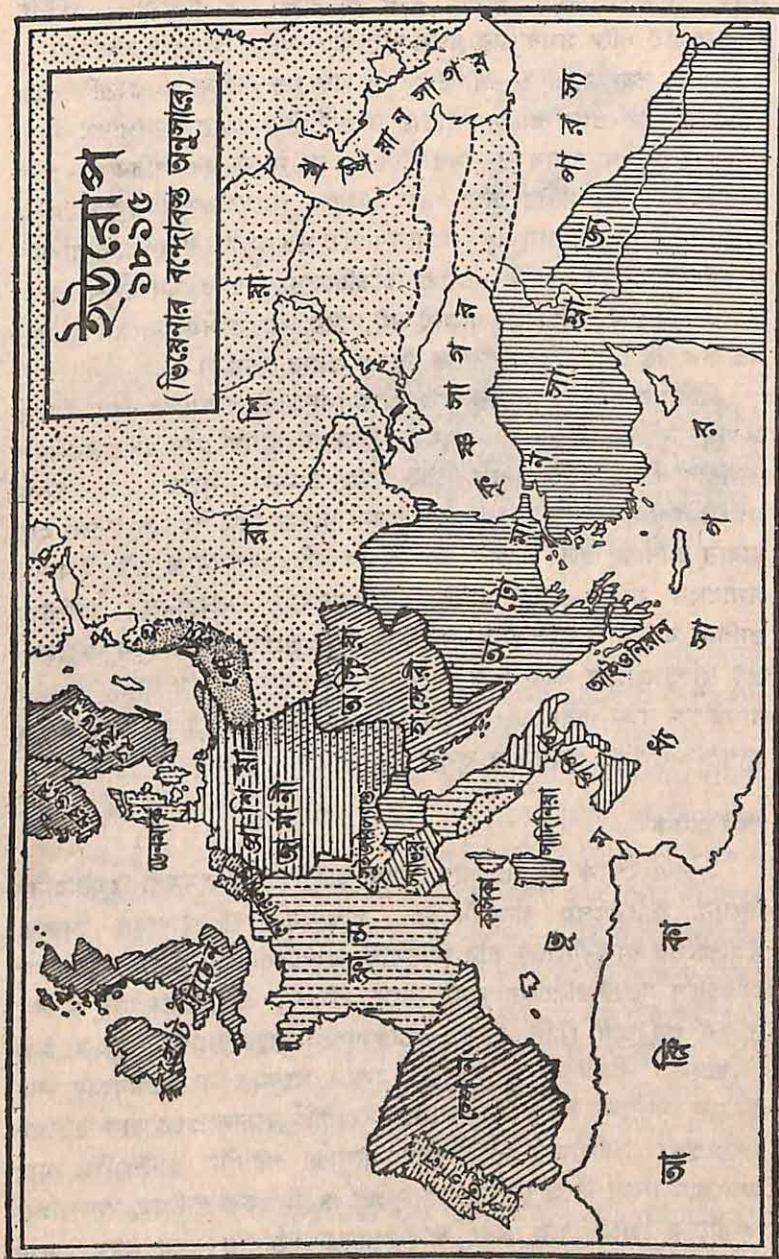
সমবায় গঠিত হ'ল। একেই বলে কনসার্ট অফ ইউরোপ। পবিত্র চুক্তিকে এই শক্তি সমবায়ের প্রথম অংশরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ন্যায়, দয়া ও শান্তি—খ্রীষ্ট ধর্মের এই মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে নতুন এক পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তাই পবিত্র চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় রাজাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব এবং প্রজাদের প্রতি সন্তানসুলভ ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যে ইওরোপের প্রায় অধিকাংশ রাজাই এই পবিত্র চুক্তিতে সই করলেন। কিন্তু সই করলেও কেউই এই চুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

পবিত্র চুক্তি ছিল ইওরোপের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী রাজাদের কাছে নিছক একটা নৈতিক আবেদন বিশেষ। ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করার পক্ষে এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। সুতরাং বাস্তব কোন পন্থা অবলম্বন করতে না পারলে ভিয়েনা সম্মেলনের সব কিছুই পণ্ড হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। তাই এক বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ডকে নিয়ে তিনি এক চতুঃশক্তি মৈত্রী গঠন করলেন। এই রাষ্ট্রজোটের কাজ হ'ল ভিয়েনার বন্দোবস্ত কায়েম রাখা, পুরাণো ব্যবস্থাকে রক্ষা করা এবং মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হয়ে ইওরোপের দেশগুলির ওপর খবরদারি করা।

মেটারনিক

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন ইওরোপের রাজনীতিতে সবচেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ইওরোপের রাজনীতিতে তাঁর অসামান্য প্রভাবের জন্যেই তাঁর মন্ত্রিত্বকাল ইতিহাসে "মেটারনিকের যুগ" নামে প্রসিদ্ধ। জাতীয়তাবাদী ও গণ-তন্ত্রের শত্রুরূপে তিনি চরম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। দেশবিদেশে যেখানেই কোন সংস্কার বা স্বাধীনতার দাবি উঠেছে সেখানেই তিনি নির্মমভাবে দমননীতি প্রয়োগ করে তার কণ্ঠরোধ করেছেন। অস্ট্রিয়ার পাঁচমিশালী সাম্রাজ্য পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে মেটারনিক পুলিশ ও গুপ্তচর লাগিয়ে, আন্দোলন-কারীদের জেলে পুরে এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে তাদের দমন করলেন।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র জার্মান জাতির মনে

যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল ভিয়েনা সম্মেলনের কর্ণধারগণ তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি। তাই তাদের অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে সমিতি গঠন করল। ক্রমে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করে জনবিক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে। জনবিক্ষোভ দমন করার জন্যে ১৮১৯ সালে কার্লসবাদে জার্মানীর বাছা বাছা কয়েকজন রাজাকে নিয়ে এক সভা বসল। সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে আইন পাশ হ'ল। এই আইনের বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর রইল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল, আর সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমিতি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এইভাবে মেটারনিকের প্রচেষ্টায় কার্লসবাদ ডিক্রি জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছিল।

মেটারনিক

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জনবিক্ষোভ শুধু অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। ১৮২০ সালে স্পেনে এবং নেপল্‌সের প্রতিক্রিয়াশীল রাজ্যশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। গতিক দেখে চতুঃশক্তির প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে 'হস্তক্ষেপের নীতি' গ্রহণ করে এক প্রস্তাব নিলেন। প্রস্তাবটি 'প্রটোকোল অফ ট্রপো' নামে প্রসিদ্ধ। এই নীতি অনুসারে কোন দেশে রাজতন্ত্র বা পুরাণো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ দেখা দিলে চতুঃশক্তি তা দমন করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হ'ল। পর পর কয়েকটি বৈঠকে নেপল্‌স্, পীডমণ্ট ও স্পেনের বিদ্রোহ দমনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। অস্ট্রিয়া ও ফরাসী সেনার সাহায্যে সর্বত্র পুরাণো রাজতন্ত্র কায়েম করা হ'ল। প্রতিক্রিয়াশীল রাজা ও শাসকগণ নির্মমভাবে প্রজাপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অবশেষে চতুঃশক্তির জগন্নাথের রথ একজায়গায় এসে বাধা পেল। ১৮২৩ সালে ইওরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমেরিকায় স্পেনের যে

সমস্ত উপনিবেশ ছিল সেগুলি বিদ্রোহ করে বসল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যত হলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মন্‌রো এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি এক ঘোষণা দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপারে ইওরোপের কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আমেরিকা বরদাস্ত করবে না। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে আর তখন কেউ সাহস করল না। চতুঃশক্তির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস শক্তিসংঘকে ক্রমেই দুর্বল করে দিচ্ছিল। সন্দেহ ও বিদ্বেষ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন শিথিল করে দিল। এই কারণেই চতুঃশক্তি মিতালি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। মেটারনিক ষড়যন্ত্র করে এবং গুপ্তচর লাগিয়ে মানুষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমাবার চেষ্টা করে-ছিলেন। ইতিহাসের গতি সামনের দিকে তা তিনি বোঝেননি। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘোরালেই কালের চাকা উল্টো পাকে ঘোরে না।

ইওরোপের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র

ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবীরা পশ্চিম ইওরোপের সর্বত্র স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিল। তাই ইওরোপের পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে স্বাধীনতা লাভ ও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপে ইতালী ও জার্মানীতে আমরা যে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব দেখতে পাই তার মূলেও ছিল ফরাসী বিপ্লবের এই বাণী। বহুকাল ধরে ইতালী ও জার্মানীর কোনরকম রাজনৈতিক একতা ছিল না। ইতালীর আবার স্বাধীনতাও ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই এই দুটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল।

ঐক্যলাভের পূর্বে ইতালীর অবস্থা

ইতালীর দুর্বলতা ও একতার অভাবের সুযোগ নিয়ে স্পেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্র সেখানকার নানা অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে নেপোলিয়ন প্রায় সমস্ত ইতালীই নিজের অধীনে এনেছিলেন। এইভাবে পূর্বের মত পরাধীন থাকলেও নেপোলিয়নের অধীনে ইতালী কিছুটা রাজনৈতিক ঐক্য পেয়েছিল।

আগেই বলেছি নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের

কর্ণধারগণ ইওরোপের দেশগুলিকে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এর ফলে ইতালী আবার বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভিনিস অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। এছাড়া সেখানকার আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে অস্ট্রিয়ার প্রভাব স্থাপিত হয়। মধ্য এবং দক্ষিণ ইতালী পোপ ও স্পেন রাজবংশের এক শাখার অধিকারভুক্ত করা হয়েছিল। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পীড্‌মন্টে এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপে একটি স্বাধীন ইতালীয় রাজবংশ রাজত্ব করত।

ইতালীতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও ম্যাৎসিনি

এই নতুন ব্যবস্থায় কিন্তু দেশপ্রেমিক ইতালীবাসীরা সন্তুষ্ট হলেন না। দেশের ঐক্য ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁরা তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। তখন 'কার্বোনারী' নামে দেশব্যাপী একটি গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের প্রচেষ্টায় ইতালীবাসীরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তিনবার বিদ্রোহী হয়েছিল।

এই সময়ে ইতালীতে ম্যাৎসিনি নামে একজন অসীম প্রতিভাশালী বক্তা ও লেখকের আবির্ভাব হয়। তিনিও ছিলেন এই কার্বোনারী দলের সভ্য। তিনি তাঁর লেখা এবং বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীদের পূর্ব

ম্যাৎসিনি কাভুর

গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ইতালীতে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিদেশী শাসকদের কুনজরে পড়ে তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়। বিদেশে গিয়ে মাতৃভূমির

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ‘নবীন ইতালী’ নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে আবার এক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। পূর্বের বিপ্লবের মত এই নতুন বিপ্লবের প্রভাবও সমস্ত ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতালীও বাদ গেল না। পীডমন্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা তখন উত্তর ইতালী থেকে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। ইতালীর অন্যান্য ছোট ছোট রাজারাও নিজেদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করতে স্বীকৃত হন। ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে রোমে এই সময়ে কিছুদিনের জন্য একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া কিছুকালের মধ্যে ইতালীর এই বিদ্রোহ দমন করে।

কাভুর

সামরিক শক্তি এবং অত্যাচারের দ্বারাও অস্ট্রিয়া ইতালীবাসীদের মন থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করতে পারল না। ১৮৪৮-এর বিদ্রোহের দশ বছরের মধ্যেই তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ’ল। এই সময়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন পীডমন্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ও তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী কাভুর। কাভুরের উদ্দেশ্য ছিল রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের অধীনে সমস্ত ইতালীকে একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত করা। তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশের ঐক্য আনতে হলে তাঁকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হবে। অথচ পীডমন্ট-সার্ডিনিয়ার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এর জন্যে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কাভুর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান এবং তাদের সহানুভতি লাভ করেন। এর চার বছর পরে তিনি ফ্রান্সের সাহায্যে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে লম্বার্ডি প্রদেশটি কেড়ে নিলেন। অস্ট্রিয়ার এইভাবে পরাজয় হওয়াতে ইতালীবাসীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হ’ল এবং সমস্ত দেশ-ব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। উত্তর ও মধ্য ইতালীর স্বেচ্ছাচারী রাজাদের বিতাড়িত করে সেখানকার লোকেরা সার্ডিনিয়ার রাজার অধীনে ক্রমে মিলিত হ’ল। মধ্য ইতালীতেও পোপের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে গেল।

গ্যারিবল্ডী

দক্ষিণ ইতালীর সিসিলি এবং নেপল্‌স্‌ মুক্ত করেন গ্যারিবল্ডী নামে ইতালীর একজন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা। কয়েক হাজার স্বেচ্ছা-

সেবক সৈন্যের সাহায্যে তিনি এই অসম সাহসিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। গ্যারিবল্ডী ছিলেন ম্যাৎসিনির শিষ্য এবং 'নবীন ইতালী' সমিতির সভ্য। গুপ্ত সমিতির সভ্য বলে তাঁকেও বহুকাল বিদেশে থাকতে হয়েছিল। গ্যারিবল্ডী এবং কাভুর ছিলেন দুটি স্বতন্ত্র দলের নেতা। ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করা দুজনের উদ্দেশ্য হলেও তাঁদের পন্থা ছিল ভিন্ন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী বুঝেছিলেন যে, সার্ডিনিয়ার রাজার সাহায্য ছাড়া ইতালীকে এক করবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি নিজের মত বিসর্জন দিয়ে কাভুরের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং সিসিলি ও নেপল্‌স্ সার্ডিনিয়ার সঙ্গে এক ঐক্যবদ্ধ ইতালীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

গেরিবাল্ডী

কাভুর তাঁর মৃত্যুর আগে ভিনিস এবং রোম বাদে সমগ্র ইতালীকে একত্র করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এদুটি স্থানও শীঘ্রই ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়ে ইতালী ভিনিস অধিকার করে। এর কিছুকাল পরে রোমও ইতালীবাসীদের হাতে চলে আসে। এইভাবে ম্যাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডী— এই তিনজন সুযোগ্য নায়কের নেতৃত্বে ইতালী এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়।

ঐক্যলাভের পূর্বে জার্মানীর অবস্থা

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীতে যখন ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন তাদের চোখে ছিল এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের স্বপ্ন। তাই নেপোলিয়নের পতনের পর তারা স্বভাবতঃই আশা করেছিল যে, তাদের সেই স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন বুঝি সফল হবে। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনের কর্ণধারগণ জার্মানীকে উনচল্লিশটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সমন্বয়ে গঠিত একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করলেন। অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্বে ফেডারেল ডায়েট (Federal Diet) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

পরিষদ গঠিত হ'ল। এইভাবে জার্মানীতে আগের মত অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যই বজায় থেকে গেল।

জার্মানীতে স্বাধীনতা আন্দোলন

ইতালীয়দের মত দেশপ্রেমিক জার্মানরাও তাদের দেশে ঐক্য এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার বিদ্রোহী হয়। ১৮৪৮ সালে সমগ্র
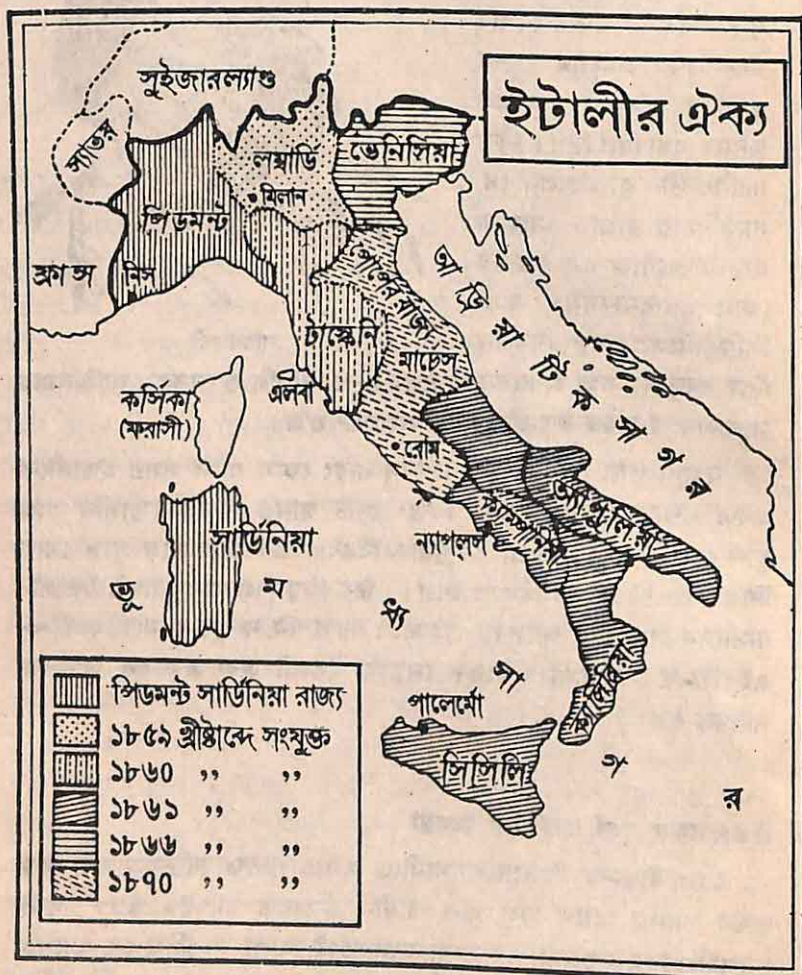
ইওরোপে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল জার্মানীতে তা প্রবল আকার ধারণ করে। তখন জার্মানীর অনেক রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়। ছোট ছোট বহু রাজ্যের রাজা সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা তখন এক নতুন

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করবার জন্য ফ্রাঙ্কফার্ট শহরে মিলিত হলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সমস্ত জার্মানীর রাজমুকুট গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া শক্তি সঞ্চয় করে জার্মানীর এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিল।

বিসমার্কের অভ্যুত্থান

১৮৬১ সালে ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর ভাই প্রথম উইলিয়ম। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার সমর্থক এবং সেই হিসেবে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তাই তিনি রাজা হবার পর তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এমন একজন মানুষকে বেছে নিলেন যিনি তাঁর সমমনোভাবাপন্ন। তাঁর নাম বিসমার্ক। বিসমার্কও ছিলেন উইলিয়ামের মতরাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের সমর্থক। বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি বুঝেছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার শক্তিকে খর্ব করতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার আগে প্রয়োজন ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির এবং তার জন্যে প্রয়োজন অর্থের। প্রতিনিধি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ উদারপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সামরিক শক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করে চললেন। এইভাবে প্রাশিয়ার সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ করবার পর বিসমার্ক পর পর তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ করলেন।

বিসমার্ক

শ্লেজউইগ-হলস্টাইন প্রশ্ন

জার্মানীর উত্তরে শ্লেজউইগ ও হলস্টাইন নামে দুটি প্রদেশের ডিউক ছিলেন ডেনমার্কের রাজা। ১৮৪৮ সালে ডেনরাজ এই দুটি অঞ্চলকে ডেনমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করবার চেষ্টা করলে সেখানে এক তুমুল গণবিক্ষোভ

দেখা দেয়। লণ্ডন চুক্তিতে ঐ দুটিকে ডেনমার্কের সাম্রাজ্যভুক্ত করা চলবে না বলে ঘোষণা করায় গণবিক্ষোভ তখনকার মত থেমে যায়। ১৮৬৩
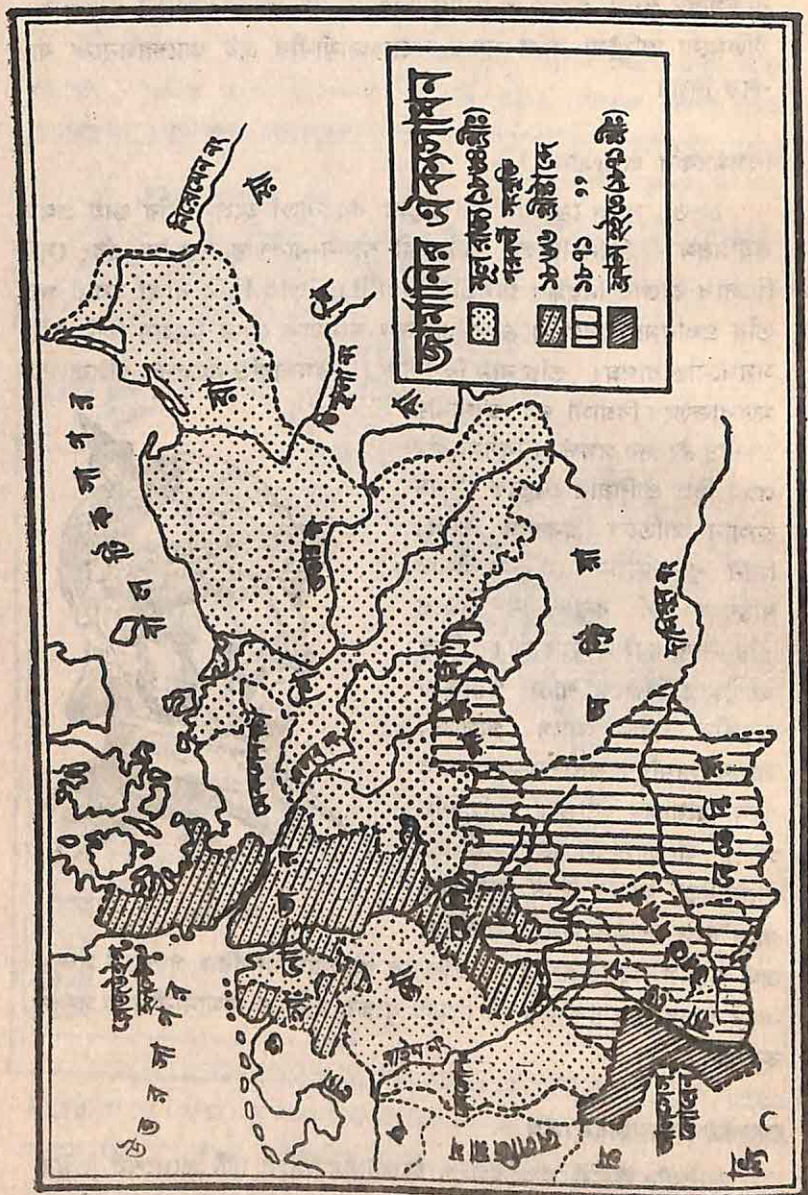
সালে ডেনরাজ লণ্ডন চুক্তি ভঙ্গ করে শ্লেজউইগের ওপর এক নতুন সংবিধান চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে আবার সেখানে গোলযোগ দেখা দিল।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মিলিত বাহিনী তখন ডেনমার্ক আক্রমণ করে ডেন-রাজাকে পরাজিত করল। ভিয়েনার সন্ধি অনুসারে ডেনরাজ ঐ দুটি রাজ্যখণ্ডের ওপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেন।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ

ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধের পর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সার্থকভাবে কূটনীতি প্রয়োগ করতে না পারলে অস্ট্রিয়ার মত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে পরাস্ত করা যাবে না। তাই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে নিরপেক্ষ করে রাখা। এইভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য থেকে অস্ট্রিয়াকে বঞ্চিত করে রাখতে পারলে তাকে পরাজিত করা তখন অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। ফ্রান্সের অনুকূলে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করে বিসমার্ক প্রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংঘর্ষে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও বিসমার্কের কূট-নীতির জয় হ'ল। পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমনে বিসমার্ক রাশিয়াকে সাহায্য করায় তিনি জার আলেকজাণ্ডারের সহানুভূতি লাভ করলেন। আগেই বলেছি শ্লেজউইগ-হলস্টাইন রাজ্য দুটি অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যৌথ অধিকারে রাখা হয়েছিল। এই যৌথ অধিকার নিয়ে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে তুললেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিসমার্ক হলস্টাইন দখল করে নিলেন। এই যুদ্ধই ইতিহাসে স্যাডোয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'ল। ফলে সমস্ত উত্তর জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়া বিতাড়িত হ'ল আর সেই সঙ্গে সেখানে প্রাশিয়ার প্রভাব প্রবল হয়ে উঠল।

তখন অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে উত্তর জার্মানীর রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি নতুন রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হল। এর নাম দেওয়া হ'ল উত্তর জার্মান যুক্তরাষ্ট্র। এখন বাকী রইল শুধু দক্ষিণ জার্মানী।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ

বিসমার্ক ভালভাবেই জানতেন যে, উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলির সংযুক্তি ফ্রান্স কিছুতেই ঘটতে দেবে না। কারণ সেটা হবে ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং দক্ষিণ জার্মানীতে প্রতিপত্তি স্থাপন করতে হলে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাই যুদ্ধের জন্য বিসমার্ক একটা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ঐ

সময়ে ফ্রান্সের অধিপতি ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। স্পেনের সিংহাসনে কে বসবে—এই প্রশ্ন নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। ১৮৭০ সালে সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হ'ল। তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং ফ্রান্সে আবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিসমার্ক ফরাসীদের কাছ থেকে আলসাস্-লোরেন প্রদেশ দুটি কেড়ে নিলেন এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন। এই যুদ্ধের সময় দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। জয়লাভের পর জার্মান রাষ্ট্রগুলির অনুরোধে প্রাশিয়ার রাজা সমগ্র জার্মানীর সম্রাট বলে ঘোষিত হন। এইভাবে বিসমার্কের কূটনীতি ও প্রাশিয়ার সৈন্যদের শক্তির বলে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যবিধান সম্পূর্ণ হয়েছিল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

ভূমিকা ঃ (আমেরিকায় দাসপ্রথার উদ্ভব)

বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। রোমান আমলে এই প্রথা ইওরোপে খুব প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই নিষ্ঠুর প্রথা ইওরোপ থেকে ধীরে ধীরে লোপ পায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইওরোপের বণিকেরা নব আবিষ্কৃত আমেরিকায় চাষের কাজ করার জন্যে দাস বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। তারা আফ্রিকার উপকূলে নেমে সেখানকার নিগ্রোদের ছলে বলে ভুলিয়ে বা লোভ দেখিয়ে আমেরিকায় ধরে নিয়ে আসত। সেখানকার জমির মালিকেরা খুব কম দামে এদের কিনে নিয়ে চাষের কাজে নিযুক্ত করতেন। এইভাবে বর্তমান যুগের গোড়ার দিকে আমেরিকায় দাসপ্রথা চালু হয়ে যায়। দাসদের প্রতি

দাস নিগ্রহ

কিরকম অমানুষিক অত্যাচার করা হ'ত তারই একটি মর্মস্পর্শী এবং জীবন্ত চিত্র আমরা পাই বীচার স্টো প্রণীত "আঙ্কল টমস্ কেবিন" নামক বইতে। দাসদের ভাল করে খেতে দেওয়া হ'ত না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এতটুকুও বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে তাদের খাটিয়ে নেওয়া হ'ত। কাজে একটু শিথিলতা দেখা দিলে চাবুকের ঘা পড়ত তাদের পিঠে। কেউ যদি এই অত্যাচারের হাত থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত তাহলে তাদের হত্যা করা হ'ত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইওরোপে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শেষে উইলবার ফোর্স নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির চেষ্টায় ইংলণ্ডে দাসপ্রথার উচ্ছেদ হয়। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরে ইওরোপের অন্য সব দেশেও এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ নিয়ে আমেরিকায় গোলযোগ

আমেরিকায় কিন্তু ব্যাপারটার এত সহজে মীমাংসা করা সম্ভব হ'ল না। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হ'ল। উত্তরের রাজ্যগুলি ছিল শিল্পপ্রধান। শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ আমেরিকায় এসে পেঁছিবার পর উত্তরাঞ্চলে বহু কলকারখানা গড়ে ওঠে। সেইসব কারখানার মালিকেরা মজুরি দিয়ে লোক রাখত। তাই দাসপ্রথার বিলোপ হলে উত্তরাঞ্চলের কারখানা মালিকদের কোন আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। বরং তারা মনে করত এই প্রথার বিলোপ হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ক্রীতদাসদের তারা তখন কম মজুরিতে নিজেদের কারখানায় স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করতে পারবে।

অপরদিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। সেখানে কলকারখানা তেমন গড়ে ওঠেনি। তাই চাষবাসই ছিল সেখানকার লোকদের আয়ের প্রধান উৎস। সেখানে উৎপন্ন হ'ত তূলা, তামাক, আখ, চাল, গম ইত্যাদি। তার ওপর দক্ষিণের দেশ ছিল গরম। কাজেই সেখানে চাষের কাজের জন্য মজুর পাওয়া যেত না। তাই তারা ক্রীতদাসদের দিয়ে ক্ষেতে খামারে কাজ করাত। এতে চাষের খরচও পড়ত অনেক কম। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেলে জমির মালিকদের বেশী মজুরি দিয়ে লোক রাখতে হবে। তাতে তাদের আর্থিক ক্ষতি। তাই তারা ক্রীতদাস প্রথা বজায় রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

আমেরিকার উপনিবেশগুলি যতই বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল, ততই

নতুন নতুন অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে দাসপ্রথা থাকবে কিনা এই নিয়ে উত্তর-দক্ষিণের বিবাদ বেড়ে চলল। আপস মীমাংসার সব রকম চেষ্টা নিষ্ফল হবার পর দক্ষিণের লোকেরা ঘোষণা করল যে, তারা একটা আলাদা রাষ্ট্র গড়ে তুলবে।

আব্রাহাম লিঙ্কন

এই সময়ে আমেরিকায় এক নতুন প্রজাতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি হয়। এই দলের মূলনীতি ছিল ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপন করা। ১৮৬০ সালে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই দল (দাসপ্রথা বিরোধী ও দাস প্রথার সমর্থক) সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল। উত্তরের রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে দাঁড়ালেন আব্রাহাম লিঙ্কন আর দক্ষিণের রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে দাঁড়ালেন স্টিফেন ডগ্‌লাস। লিঙ্কন জয়ী হলেন।

লিঙ্কন ছিলেন দাসপ্রথা বিরোধী দলের নেতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির এবং দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি। আমেরিকার কেন্টাকী প্রদেশে খুব গরীব এক কৃষকের ঘরে তাঁর জন্ম। খুব বেশি লেখাপড়া শেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি। শুধু নিজের অধ্যবসায় ও প্রতিভার দ্বারা তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি যা ভাল বলে মনে করতেন সে কাজ থেকে তিনি কখনও সরে আসতেন না। ছেলেবেলাতেই দাস প্রথার নিষ্ঠুরতা তাঁকে খুব বিচলিত করে তোলে। কাজেই তিনি দাস প্রথার উচ্ছেদ কামনা করতেন। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পরেই লিঙ্কন দক্ষিণের লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, আলাদা রাষ্ট্র তাদের কোন মতেই গড়তে দেওয়া হবে না। ফলে তখন আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠ্‌ল।

আব্রাহাম লিঙ্কন

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ঃ অন্যান্য কারণ

ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মতবিরোধ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ। এছাড়া আরও কতকগুলি

অর্থনৈতিক কারণে দক্ষিণের লোকদের মনে একটা ক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। শিল্পোন্নয়নের ফলে উত্তরের লোকেরা হয়ে উঠেছিল অনেক বেশী সমৃদ্ধিশালী। সে তুলনায় দক্ষিণের লোকেরা ছিল অনগ্রসর। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য তাদের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চল শিল্পজাত পণ্যের জন্য উত্তরাঞ্চলের ওপর নির্ভর করত। উত্তরাঞ্চল তাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর শুল্ক স্থাপন করেছিল। ফলে দাক্ষণের লোকদের বেশি দামে শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে হ'ত। তাই তারা শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর শুল্ক স্থাপনের বিরোধিতা করতে থাকে।

উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রাধান্য ভোগ করত। তাই দক্ষিণের অধিবাসীদের ধারণা হ'ল যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে না পারলে উত্তরাঞ্চলের প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে না। তারপর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে লিঙ্কন যখন নির্বাচনে জয়ী হলেন তখন দক্ষিণের রাজ্যগুলির ভয় হ'ল যে, এইবার দাসপ্রথা বিলোপ হবেই। তাই দক্ষিণের এগারটি রাজ্য তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক নতুন রাজ্যসংঘ গঠন করল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখার জন্যে লিঙ্কন দক্ষিণী রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

প্রায় চার বছর ধরে আমেরিকায় এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল। দাসপ্রথার বিস্তার বন্ধ করতে হবে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া হবে না—এই সঙ্কল্প নিয়ে লিঙ্কন অবিচলিতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। যুদ্ধ চলাকালীন ১৮৬৩ সালে লিঙ্কন এক ঘোষণা দ্বারা দাসপ্রথা রদ করে দিলেন। এর ফলে বহু নিগ্রো দাস দক্ষিণ দেশ থেকে পালিয়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীতে যোগ দিল। তবু বিদ্রোহীরা দমবার পাত্র নয়। বহু লোকক্ষয় হ'ল, ব্যবসা বাণিজ্য অচল হ'ল, জনসাধারণের দুর্দশার সীমা রইল না। শেষ পর্যন্ত আব্রাহাম লিঙ্কনের ধৈর্য ও পরিশ্রমের জয় হ'ল। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। যুদ্ধে জয়লাভের পরেই লিঙ্কন এক গুপ্ত শত্রুর হাতে প্রাণ হারালেন।

গৃহযুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের জয় হওয়ার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দূর হয় এবং নিগ্রোরা ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার লাভ করে। কিন্তু কাগজে কলমে তাদের অধিকার দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে কালো চামড়ার প্রতি সাদা চামড়াদের বিদ্বেষ আজও সেদেশ থেকে সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এই বর্ণ-সমস্যার সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কেনেডি

এই জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লিঙ্কনের মত তাঁকেও এক আততায়ীর হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

ইওরোপের শিল্পায়ন

একদা ইংলণ্ডে যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় তা ধীরে ধীরে ইওরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের আগে ইওরোপের মানুষ কলকারখানা চালাবার জন্যে নির্ভর করত প্রধানত জল এবং বাতাসের শক্তির ওপর। কিন্তু প্রকৃতির এই শক্তির যোগান বারমাস সমান থাকে না। তাছাড়া জল আর বাতাসের সাহায্যে বড় কারখানা চালানো যায় না। তাই আমরা দেখতে পাই বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের আগে ইংলণ্ডের মতই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট কারখানা। এগুলি ছিল অনেকটা কুটীর শিল্পের মত আর এই সব কারখানা চালাতে লোকেরও প্রয়োজন হত খুব কম। গ্রামাঞ্চলে নদীর ধারে যেখানে প্রচুর জল পাওয়া যায় এবং ফাঁকা মাঠের মধ্যে যেখানে পর্যাপ্ত হাওয়া খেলে সেইসব জায়গাতেই ঐসব কলকারখানা গড়ে উঠেছিল।

জল আর বাতাসের তুলনায় বাষ্পের শক্তি অনেক বেশি। তাই এই বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের পর থেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ভারীশিল্প গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এই ভারী শিল্পকে চালু রাখতে হলে যেসব কাঁচা মালের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে কয়লা আর লোহাই হচ্ছে প্রধান। তাই দেখা যায় শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ইওরোপের সর্বত্র কয়লা এবং লোহার চাহিদা বেড়ে গেল হুহু করে। তাছাড়া স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত করা অনেক সহজ এবং দ্রুত হয়ে গেছে। ফলে গোটা পৃথিবীটাই যেন এখন চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে। তাই যেসব দেশে কয়লা বা লোহা নেই তারাও কিন্তু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েনি। অন্য দেশ থেকে সেই সব জিনিস আমদানি করে তারা নিজেদের দেশে গড়ে তুলেছে ভারী শিল্প। এই ভারী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশের কুটীর শিল্পগুলি এঁটে উঠতে পারল না। ফলে গ্রামে গ্রামে দেখা দিল বেকার সমস্যা। কুটীর শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় গ্রামের শিল্পী, মজুর, উদ্বাস্তু চাষী সবাই এসে ভীড় করতে শুরু করল শহরের শিল্পাঞ্চলে কাজের খোঁজে।

এইভাবে ইওরোপে যে যন্ত্রযুগের সূচনা হ'ল তা সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে ওলট পালট করে দিল। প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ করায়ত্ত করে মানুষ যেমন একদিকে জীবনের অনেক সুখ-সুবিধা লাভ করেছে, তেমনি আবার এর ফলে বহু নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। বড় বড় কারখানা

স্থাপন করতে মোটা মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেই মূলধন সংগ্রহ করবার ক্ষমতা আছে সীমিত সংখ্যক ধনী ব্যক্তির। সেই সব ধনীরা দেশে যন্ত্রশিল্প স্থাপন করে পণ্য উৎপাদন একচেটিয়া করে নিল। ফলে সেই মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় দিন দিন আরও ধনী হয়ে উঠতে লাগল। এই-ভাবে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমেই আরও বেড়ে যেতে থাকল।

প্রথম দিকে কারখানার শ্রমিকদের কোন সংগঠন ছিল না। তাই মালিকেরা তাদের যথেচ্ছ শোষণ করে লাভের মোটা অংশ নিজেরাই আত্মসাৎ করে নিতেন। ক্রমে মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা ধনীদের এই শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের প্রভাবে দেশের শ্রমজীবী মানুষ ক্রমেই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। তারা সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মালিক ও মজুরের শ্রেণীবিরোধ।

কার্ল মার্ক্স

আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইওরোপের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্বত্র গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটিয়েছে। সেই সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশে এক 'পুঁজিপতি' শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে রাজারাই প্রজাদের পীড়ন ও শোষণ করতেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেখা গেল রাজার স্থান দখল করেছেন পুঁজিপতি শ্রেণীর মানুষেরা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর শুরু হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব ও শোষণ। এইরকম এক যুগসন্ধিক্ষণে ১৮১৮ সালে জার্মানীর এক মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে কার্ল মার্কস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজে আর্থিক বৈষম্যের কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রাশিয়া সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তাঁর স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হন। তখন গণতান্ত্রিক দেশের সর্বত্রই

কার্ল মার্কস্

পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রাধান্য আর সেই পুঁজিপতি শ্রেণীকে আক্রমণ করাই ছিল কার্ল মার্কসের প্রধান লক্ষ্য। তিনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তাদের শোষণের নগ্নরূপ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শোষিত শ্রমজীবী মানুষের কাছে। তাই কোন দেশেই তাঁর স্থান হ'ল না। তাই কিছুদিন ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াবার পর অবশেষে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

ইংলণ্ডে বাসকালীন ঐ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখে তিনি বিচলিত হন। যাদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমে মালিকদের ধন-ভাণ্ডার স্ফীত হচ্ছে সেই সব শ্রমিক উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাবে পশুর মত জীবনযাপন করে চলেছে। এই অমানুষিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দাস ক্যাপিটাল' রচনা করেন। মার্কসের মতে বিত্তশালী মালিক ও বিত্তহীন শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর সংঘর্ষ অনিবার্য, আর এই সংঘর্ষের ধ্বংস স্তূপ থেকেই জন্মলাভ করবে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা। তিনি আরও বলেছেন যে, ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আজ যারা শোষিত আগামী দিনে তারাই শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবীতে ধনতন্ত্রবাদের কবর খনন করবার জন্যে শ্রমিক শ্রেণী উপস্থিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পৃথিবীর মুক্তি সম্ভাবনা। তাই তিনি দুনিয়ার মজদুরকে এক হবার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। কার্ল মার্কসের বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এঙ্গেলস

ইংলণ্ডে থাকাকালীন কার্ল মার্কস আর একজন জার্মানবাসীর বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। মার্কস ও এঙ্গেলস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিবিড় সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস এঙ্গেলসের সহযোগিতায় বিখ্যাত "কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো" রচনা করেন। এই ইস্তাহারই আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা। এঙ্গেলস ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামে বৈপ্লবিক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনও তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতি, সমাজ ও ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণে মার্কসবাদের সার্থকতা পরীক্ষা ও প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে এঙ্গেলসের অবদান স্মরণীয়। তিনিও বলেছিলেন যে, একমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বারাই সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। মার্কসের মৃত্যুর পর জীবনের শেষ ১০-১২ বছর তিনি মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

দশম অধ্যায়

চীন ও জাপানের জাগরণ

ভূমিকা

আমরা এর আগে জেনেছি যে, নূতন দেশ আবিষ্কারের পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ করে ইওরোপের অধিবাসীরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করে। তার ফলে এই দেশ দুইটি এখন ইওরোপীয় অধিবাসীদের বংশধরদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন ছাড়াও ইওরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর আরো কয়েকটি অঞ্চলে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেমন, ইংরাজ, ওলন্দাজ ও রাশিয়ানরা যথাক্রমে ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর ও মধ্য-এশিয়ায় বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইওরোপীয়দের রাজনৈতিক অধিকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রধান কারণ ছিল ইওরোপ জুড়ে শিল্প বিপ্লব। যন্ত্রযুগের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার কারখানাগুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার যন্ত্রের সাহায্যে এত বেশী জিনিস তৈরী হতে লাগলো যে, দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও আরও অনেক উদ্‌বৃত্ত থাক্‌তো। কাজেই সেগুলো বিক্রি করবার এবং বাইরে থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ইওরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি ব্যগ্র হয়ে উঠলো। তাই তারা আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিল। এরা প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির অসহায়তার ও দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের স্বাধীনতা-হরণ ও অর্থ-শোষণ করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা তাদের 'এই শোষণের কথা অস্বীকার করতো। তারা বলতো যে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদের সভ্য করে তোলা এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করা শ্বেতাঙ্গদের অবশ্য কর্তব্য, তাই তারা কষ্ট স্বীকার করে দূর দূর দেশে এসে শাসনভার গ্রহণ করেছে।

এই অধ্যায়ে চীন ও জাপানে ইওরোপীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের কথা আলোচনা করবো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীন ও জাপানের সঙ্গে বাইরের জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের আরম্ভে এই দেশ দুইটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ এই সময় বিদেশীদের সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের

কোন আগ্রহ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এইভাবেই কাটে। তারপর প্রায় একই সময় পাশ্চাত্য জগতের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা জোর করে এই দুটি দেশের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে আবার তাদের বাইরের জগতের কাছে প্রকাশ করে। একই সময় পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এলেও চীন ও জাপানে এর ফল হয়েছিল বিভিন্ন রকমের। চীনের অধিবাসীরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করতে সর্ব-রকমে অস্বীকার করলো, কিন্তু বিদেশীদের আক্রমণ থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারলো না। ফলে এই প্রাচীন দেশটি ক্রমেই দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকে। জাপানীরা প্রথমে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করে এবং সর্বরকমে এই সভ্যতাকে গ্রহণ করে ইওরোপীয়দের মতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

(ক) ইওরোপীয়দের আগমনে চীনদেশে প্রতিক্রিয়া—চীন দেশের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন—অহিফেন যুদ্ধ

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম সাগর-পথে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তাদের ঘাঁটি ছিল চীনের পূর্বকূলে অবস্থিত ম্যাকাও দ্বীপে। পর্তুগীজদের অনুসরণ করে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও চীনের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে। তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল হংকং-এ। এই সময় চীনের অধিকাংশ অধিবাসী আফিং-এর প্রতি আসক্ত ছিল। ইংরাজরা গুপ্তভাবে ভারত-বর্ষ থেকে চীনে আফিং চালান দিত, আর সেই আফিং খেয়ে চীনের অধিবাসীরা ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছিল। উনিশ শতকের শুরুতেই চীনসম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যে আফিং বিক্রি বন্ধ করবার আদেশ দেন। কিন্তু এই আদেশ সফল হল না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার পুনরায় এই ঘৃণিত ব্যবসা জোর করে বন্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। তখন ক্যান্টন শহরের একজন রাজকর্মচারী অনেকখানি আফিং বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে পরের বছর (১৮৪০) চীন ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছে। কিন্তু ইংরাজদের উন্নততর সামরিক বলের কাছে চীন সম্রাটকে নতি স্বীকার করতে হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুই পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল ইতিহাসে তা নানকিং-এর সন্ধি বলে পরিচিত।

তখন ইংরাজরা চীন-সম্রাটের কাছ থেকে জোর করে ক্যান্টন, সাংহাই প্রভৃতি দক্ষিণ চীনের পাঁচটি বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করবার অধিকার আদায় করে নেয়। এছাড়া হংকং দ্বীপে তাদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হল।

ইংরাজদের এই অসামান্য সাফল্য লাভের পর ক্রমে আমেরিকান জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিরাও এই পাঁচটি বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে। প্রায় পনের বছর পরে আফিং-এর ব্যবসা নিয়েই চীনের সঙ্গে ইংরাজদের আবার একটি যুদ্ধ হয়। এবার ফরাসীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হল। এই সন্ধি তিয়েন্‌সিনের সন্ধি (১৮৫৮) নামে পরিচিত। প্রথম অহিফেন্‌ যুদ্ধের ফলে মাত্র পাঁচটি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে আরো এগারোটি বন্দর বিদেশীদের হস্তগত হয়। তাছাড়া চীনের অভ্যন্তরেও তারা ব্যবসা করবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। বিজয়ী পাশ্চাত্য দেশগুলি চীন সম্রাটকে তাঁর সভায় বিদেশী দূতদের স্থান দিতেও বাধ্য করলো। আরো স্থির হল যে, চীনের কোন আদালত বিদেশীদের বিচার করতে পারবে না, তাদের বিচার হবে বিদেশীদেরই স্থাপিত আদালতে। এইভাবে পাশ্চাত্য জাতিরা জোর করে চীনকে বাইরের জগতের কাছে উন্মুক্ত করেছিল।

চীন পর পর দুটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তিগুলি চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাশিয়া আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে ক্রমে জাপান সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেখানে ব্লাডিভস্টক্‌ বন্দরের প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নবজাগ্রত জাপানের হাতে চীন সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে। সন্ধির শর্তানুসারে জাপান ফরমোসা (তাইওয়ান) ও পেস্কাডোর দ্বীপপুঞ্জের অধিকারী হয়। এছাড়া জাপান ইওরোপীয়দের ন্যায় নানারকম বাণিজ্যিক সুবিধাও লাভ করেছিল।

চীনে বিদেশীদের ভাগ-বাটোয়ারা

চীন-জাপানের যুদ্ধের ফলে চীনের সামরিক দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সুযোগ পেয়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি চীনের কাছ থেকে "কনশেসন্‌" বা আরো বেশী সুযোগ আদায়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করে এবং পার্শ্ব-বর্তী সমগ্র অঞ্চলটি লিজ নেবার দাবী জানায় এবং তা লাভও করে। এর ফলে চীনের তখনকার রাজবংশীয়দের পিতৃভূমি মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন রাজ্যে পরিণত হল। জার্মানী কিয়াউ-চাউ ও সান্টং-এ নিজস্ব আধিপত্য স্থাপন করলো। ইংলণ্ড লিজ হিসেবে গেল কোলুং ও

ওয়াই-হাইওয়ে; এছাড়া ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকায় সে নিজের আধিপত্য স্থাপন করবার অধিকার আদায় করে নিল। ফ্রান্সের ভাগে পড়লো কাংসি, হাইনান ও টংকিং অঞ্চল। এই সকল বিদেশীরা চীনে বাস করেও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। চীনকে এইভাবে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করার নীতি আমেরিকার পছন্দ হল না। সে তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জন হে-র মারফত দাবী জানাল যে, চীনের অখণ্ডতা ব্যাহত করা চলবে না এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমস্ত চীনই বিদেশীদের কাছে খোলা রাখতে হবে। আমেরিকানদের এই "খোলা দরজা"র (Open door) নীতির জন্য চীনের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেলো না।

বিদেশী আক্রমণের ফলে চীনের প্রতিক্রিয়া

দুর্বল মাঞ্চু সরকার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও চীনের জনগণ তা মেনে নিতে অসম্মতি জানায়। তারা বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগেই এর সূচনা দেখা দিয়েছিল। জনগণের এই প্রথম বিদ্রোহটি তাইপিং বিদ্রোহ বলে পরিচিত। এই বিদ্রোহ প্রায় বারো বছর ধরে চলেছিল (১৮৫৩-৬৫)। লক্ষ লক্ষ কৃষক এতে যোগ দেয়। এই বিদ্রোহীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চুবংশীয় সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে একটি "স্বর্গ-রাজ্য" স্থাপন করা। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন হাং-সিং-চুয়াং। তিনি দাবী করতেন যে, ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি এই বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাইপিং বিদ্রোহ সফল হয়নি। তার কারণ চীন সরকার পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও দেশপ্রেমিকদের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, চীনদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে একই সঙ্গে মাঞ্চু-সরকার এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীদের হাতে চীনের পরাজয় এবং ১৮৯৮ সনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনের বাটোয়ারা দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষদের বিশেষ শংকিত কোরে তোলে। তাদের দু-জন নেতা সম্রাটকে বোঝালেন যে, যুগোপযোগী সংস্কার ছাড়া চীনের কোন পরিত্রাণ নেই। সম্রাট তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করলেন এবং একশত দিনের মধ্যে তিনি এমন কতকগুলি সংস্কার সাধন করলেন যাতে মনে হ'ল যে, চীন একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু রক্ষণশীল দল এইসকল সংস্কারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো, তাদের নেতৃত্ব দেন বিধবা রাজরানী জু সি। তিনি

বল্লেন পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠা করে দেশের উন্নতিসাধন করা যাবে না। দেশের মানুষের উন্নতি সাধন করতে হলে আমূল নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি ষড়যন্ত্রের ফলে সম্রাট বন্দী হলেন। নব্য সংস্কারক দলও সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হল। তখন থেকে রানী জু হলেন দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী।

চীনের জাগরণ ও 'বক্সার' বিদ্রোহ (১৯০০)

এদিকে মাঞ্চুবংশীয়দের কুশাসন এবং বিদেশীদের স্বেচ্ছাচারের ফলে চীনের জনসাধারণের মনে জাতীয়তা বোধ জেগে উঠ্ছিল। তাদের মধ্যে একদল দেখলেন যে, দেশকে বাঁচাতে হলে জাপানের মত চীনকেও ইওরোপের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এঁদের বিদেশী-বিরুদ্ধভাব ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময় দেশের মধ্যে "মুষ্টি যোদ্ধার দল" (Boxers) নামে একটি গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এরা বিদ্রোহী হয়ে বিদেশী বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের হত্যা করতে থাকে। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিগুলি ও জাপান একত্র হয়ে এদের দমন করল।

'বক্সার' বিদ্রোহের বিফলতা দেখে চীনের প্রগতিশীল নেতারা জাপানী-দের অনুকরণে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। উপায়ান্তর না দেখে বিধবা মহারানী জু সিও এ বিষয়ে কিছুটা উৎসাহ দেখান। দেশের মধ্যে বহু স্কুল-কলেজ স্থাপিত হল; ছাত্রদের বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া হতে লাগলো। ইওরোপের শাসনপদ্ধতি শিক্ষা করবার জন্য সেখানে কয়েকজন লোককে পাঠানো হ'ল। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সেনাবাহিনী নূতন করে ঢেলে সাজান হয়; অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নূতন রেলপথ নির্মাণের ব্যবস্থাও হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা সংস্কারের ব্যবস্থা হ'ল। ১৯০৯ সনে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক বিধানসভা স্থাপিত হয়। এদের দাবীতে ১৯১০ সনে একটি জাতীয় সভা আহ্বান করা হ'ল।

ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন ও ১৯১১ সনের বিপ্লব

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, চীনে এই সময় মাঞ্চুবংশীয় রাজারা রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিদেশী, চীনের উত্তরে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া থেকে তাঁরা এসেছিলেন। চীনের অধিবাসীরা এদের বড় ঘৃণা করতো। তাই ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক নেতারা এই রাজ-বংশকে অপসারিত করে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে উৎসুক হয়ে উঠে-

ছিলেন। তাঁরা রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ক্রমে দক্ষিণ চীনে তাঁদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মধ্য চীনের বড় শহর নানকিং অধিকার করে বিপ্লবীরা চীনকে একটি সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন। সুন্-ইয়াৎ-সেনই হলেন এই নতুন সাধারণতন্ত্রের প্রথম অস্থায়ী সভাপতি। নতুন সরকারের রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হল নানকিং-এ।

ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন

সুন্-ইয়াৎ-সেন ও য়ুয়ান-শি-কাই

১৯১১ সনে বিপ্লব শুরু হলে মাঞ্চু সরকার তাদের প্রধানমন্ত্রী য়ুয়ান-শি-কাই নামে একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাজধানী বিজিং এবং উত্তর চীনে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। দু' পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় স্থির হ'ল যে, য়ুয়ান চীনের নাবালক সম্রাটকে সিংহাসন পরিত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করবেন। তবে সম্রাটের ব্যক্তিগত মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। রাজার অভিভাবক নিরুপায় হয়ে এই শর্ত মেনে নেন। এর বদলে সুন্-ইয়াৎ-সেন নিজেও পদত্যাগ করে য়ুয়ান-শি-কাইকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন (১৯১২)। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ এবং সুদক্ষ সেনাপতি য়ুয়ান-শি-এর নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রী চীন আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে—এই ছিল ডাক্তার সুনের আশা।

(খ) বৃহৎ শক্তিরূপে জাপানের আত্মপ্রকাশ

আমরা এর আগে পড়েছি যে প্রাচীনকাল থেকেই জাপানে একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁর উপাধি মিকাডো। জাপানীরা মনে করতো যে তাদের সম্রাট বংশ—সূর্যদেবের সন্তান। এই বংশ এখন রাজত্ব করছে। জাপানীরা তাই তাদের সম্রাটকে দেবতার মত সম্মান করে। আমরা আরও পড়েছি যে, প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকে জাপানের বিভিন্ন নামজাদা বংশের—'শোগান' বা মহাসেনানায়কগণ দেশের

প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। তাদের অধীনে থাকতো বেতনভোগী সামুরাই নামক যোদ্ধবৃন্দ। সম্রাটের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে গৃহবিবাদ হলেও শোগানদের অধীনে জাপানে মোটামুটি শান্তি ও সুনিয়ম স্থাপিত হয়েছিল।

ইওরোপীয়দের আগমন

চীনের মত জাপানের সঙ্গে ইওরোপীয়দের সর্বপ্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। এক্ষেত্রেও পর্তুগীজরাই এই সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ছিল। জাপানীরা ইওরোপীয়দের প্রথমে সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু এরা যখন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে উদ্যোগ নিল তখন জাপানীদের মনে এদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জেগে ওঠে। তারা ইওরোপীয়দের শুধু তাড়িয়েই দিল না, সমস্ত পৃথিবীর কাছে জাপানের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিল। এইভাবে জাপান দুশো বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল।

কমোডর পেরির হুমকি

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাপান আবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে উন্মুক্ত হয়। কমোডর পেরি নামে একজন আমেরিকান নৌ-সেনাপতি কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে জাপানে এসে উপস্থিত হন এবং এই দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য অনুমতি দাবী করেন। যুদ্ধ-জাহাজ সঙ্গে থাকাতে জাপান পেরির দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। আমেরিকানদের অনুসরণ করে ক্রমে অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিরাও জাপানে এসে উপস্থিত হল। জাপানীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এদের কলহ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। কিন্তু তারা এইসব বিদেশীদের প্রতিরোধ করতে পারলো না। চীনে যেমনটি ঘটেছিল জাপানেও তেমনি বিভিন্ন জাতির বৈদেশিকগণ নানাবিধ সুখ-সুবিধা লাভ করল। তারা জাপানীর আইন-কানন থেকে অব্যাহতি পেল; মিশনারীরাও অবাধে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। জাপানীরা এদের প্রতিরোধ করতে পারলো না।

'মেজি' যুগের প্রবর্তন

জাপানীরা বুঝতে পারলো যে, এইসব অনাহুত বিদেশীদের দলকে তাড়াতে হবে তাদেরই অস্ত্র দিয়ে। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাপান মনে প্রাণে পশ্চিমের সভ্যতাকে গ্রহণ করলো। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ জাপ সম্রাটের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পনের বৎসর বয়স্ক পুত্র মাৎসুহিতো

(১৮৬৭—১৯১২) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় মিকাডোকে প্রকৃত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবার জন্য একটি অল্পস্থায়ী গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। মিকাডোপন্থীরাই জয়লাভ করলো। তারা ডাইমিয়ো, সামুরাই ও শোগানের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে মিকাডোর হাতেই আবার দেশ শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেয়। এই প্রাচীন সামন্ত প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব ঘটে। তরুণ সম্রাট মাৎসুহিতোর আমলে এক নবজাগরণের সাড়া পয়ে যায়। তাই ইতিহাসে এই সময়-কাল 'মেজি যুগ' নামে খ্যাত। এই যুগ শুধু সুদুর প্রাচ্যের ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাল। জাপানের সামরিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য মাৎসুহিতো জার্মানীর অন্তর্বর্তী প্রাশিয়ার অনুকরণে জন-সাধারণকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেকটি জাপানী শিশুকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে কষ্টসহিষ্ণু করে গড়েতোলা হল। শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। সেখানে ইওরোপীয় নীতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো। শিল্প ও আর্থিক উন্নতির জন্য দেশের সর্বত্র কলকারখানা, রেললাইন, টেলিগ্রাফ, বন্দর, ডক্ প্রভৃতি তৈরী করা হল। ফলে কিছুদিনের মধ্যে শিল্প ও সামরিক শক্তিতে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাপান যে কোন ইওরোপীয় শক্তির সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। এইরূপ পরিবর্তন আনতে ইওরোপীয়দের একশ বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। কিন্তু জাপান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে সেই যুগান্তরের সৃষ্টি করে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে জাপানের নবজন্ম অ্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী জাপান

চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৪—ইওরোপের কাছ থেকে জাপান যে শুধু সামরিক, বৈজ্ঞানিক বা শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞানই লাভ করেছিল তা নয়। পশ্চিমের সাম্রাজ্যলিপ্সাও সে এই সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। পনের-ষোল বছর ধরে দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে এবার নিজের অধিকার বিস্তার করতে প্রস্তুত হ'ল। চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোরিয়া রাজ্য নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। অনেক দিন থেকে কোরিয়ার ওপর রাশিয়ার নজর পড়েছিল। কিন্তু এই রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্র কোরিয়া অধিকার করে তবে জাপানেরও বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী। অথচ কোরিয়াকে বিদেশের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখবার মত সামর্থ্য চীনের ছিল

না। ক্রমে কোরিয়ার ব্যাপার নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। পাশ্চাত্য কায়দায় সুশিক্ষিত জাপানী সৈন্যদের হাতে চীনের বিপুল সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল। এই যুদ্ধের ফলে যে সন্ধি হয় (শিমনোসেকের সন্ধি, ১৮৯৫) তাতে চীন কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হল। আসলে কিন্তু এই সময় থেকেই কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়াও জাপান চীনের অধিকৃত ফরমোসা (তাইওয়ান) ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার ও লিয়াং টাং প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর অধিকার করল। এখানেও শেষ হল না। ইওরোপীয়দের মত জাপানীরা চীনের কাছ থেকে কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা এবং চীনের আইন-কানুন থেকে অব্যাহতি আদায় করে নিল। জাপানের শক্তিবৃদ্ধি রাশিয়াকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। তাই ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে একত্র হয়ে রাশিয়া জাপানকে বাধ্য করল লিয়াং টাং ও পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরিয়ে দিতে। জাপান এ অপমান ভুলতে পারল না।

ইঙ্গ-জাপ মিত্রতা, ১৯০২

জাপানের বিস্ময়কর জয়লাভে পশ্চিমের শক্তিগুলি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে তারা জাপানের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার মেনে নেয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া চীনে শান্তিপূর্ণভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা এর আগে দেখেছি যে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া তাড়াতাড়ি পোর্ট আর্থার দখল করে এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল লিজ হিসেবে লাভ করে। মাঞ্চুরিয়ায়ও রাশিয়ার প্রভাব চীন মেনে নিয়েছিল। রাশিয়ার এই অগ্রগমন জাপান এবং ইংলণ্ড উভয় দেশকেই আশংকিত করে তোলে। এর প্রতিবিধানের জন্য ১৯০২ সালে এই দুই শক্তি মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই মিত্রতার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কারণ এর ফলে জাপান ইওরোপীয় একটি বৃহৎ শক্তির সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও জাপানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃতি পেল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ, ১৯০৪

চীন-জাপানের যুদ্ধের দশ বছর পরে মাঞ্চুরিয়ার আধিপত্য নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সংঘর্ষ বাধে। কোরিয়ার মত মাঞ্চুরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, রাশিয়া বা জাপান যে পক্ষই তার উপর আধিপত্য করুক না কেন অপরের পক্ষে তাতে বিপদগ্রস্ত হবার

সম্ভাবনা খুব বেশী; কারণ প্রতিপক্ষ যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারতো। রাশিয়া বাধা দেবার ফলেই জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর ও লিয়াং-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই রাশিয়া যখন মাঞ্চুরিয়ার লিয়াং-টুং উপদ্বীপ দখল করে সেখানকার দুটি বন্দরের উপর অধিকার স্থাপন করলো, তখন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখিয়ে জাপান মুকডেনের রণক্ষেত্রে এবং সুসীমার নৌযুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করে। এতে সর্বত্র তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। সে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে স্বীকৃতি গেল।

বিশ্বযুদ্ধে জাপান

রুশ-জাপান যুদ্ধের দশ বছর পর ইওরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এর এক পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া, অপরপক্ষে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী। জাপান ও চীন কিছু আগে পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। চীনারা ভেবেছিল যে, যুদ্ধের শেষে হয়ত বা তারা বিদেশী অধিকারভুক্ত প্রদেশগুলি ফিরে পাবে। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তি-গুলি যখন নিজেদের মধ্যে জীবন-মরণের যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন জাপান অসহায় চীনের কাছে নানারকম সুযোগ-সুবিধা চেয়ে একুশ দফা দাবী করে বসল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল পাঁচটি: (১) জার্মান অধিকৃত সানটুং অঞ্চল জাপানকে দিতে হবে; (২) মাঞ্চুরিয়া ও দক্ষিণ মঙ্গোলীয়া অঞ্চলে জাপানী বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে; (৩) চীনের একটি প্রধান লৌহ এবং কয়লার কারখানায় জাপানীদের যৌথ পরিচালনার অধিকার দিতে হবে; (৪) চীন অন্য কোন বিদেশী শক্তিকে নতুন কোন লিজ দিতে পারবে না; (৫) চীনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ ফাঁড়ি ও অস্ত্রাগার জাপান ও চীনের যৌথ পরিচালনাধীনে থাকবে। এই দাবীগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাপানের ইচ্ছা অনুযায়ী চীনের অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করা। একমাত্র পঞ্চম ধারাটি ছাড়া অন্য সবগুলিই চীন মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে চীনের উপর জাপানের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধ শেষ হবার পর প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিরা জাপানের এই দাবীগুলির প্রতিকার চেয়েছিল; আর সেই সঙ্গে বিদেশী স্বেচ্ছাচারিতাও যাতে চীনে অবাধে চলতে না পারে তারও দাবী তারা জানিয়েছিল। কিন্তু কোনরকম সুবিধাই চীনকে দেওয়া হল না। শেষ পর্যন্ত জাপানের স্বার্থই বজায় রইলো।

একাদশ অধ্যায়

বৃটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ (১৮৫৮—১৯১৪)

নতুন শাসনব্যবস্থা

তোমরা আগেই পড়েছ সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটে। তখন থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট। অতঃপর ভারত শাসনের জন্য ১৮৫৮ সালে পার্লামেন্ট যে নতুন আইন পাশ করে তার নাম "ভারত সুশাসন আইন"।

এই আইনের দ্বারা কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার হাতে এতদিন যে ক্ষমতা ছিল তা এখন থেকে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় নবনিযুক্ত একজন মন্ত্রীর হাতে সমর্পিত হল। সেই মন্ত্রী ভারত-সচিব আখ্যায় পরিচিত হলেন। ভারত শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তিনি ছিলেন একমাত্র নির্দেশক ও কর্ণধার। বৃটিশ অধিকৃত ভারতের উচ্চতম শাসক হিসেবে ছিলেন গভর্ণর জেনারেল (বড় লাট), দেশীয় রাজাদের কাছে তিনি ছিলেন ভাইসরয় (রাজ-প্রতিনিধি)। ভারত-সচিবের পরামর্শে গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হতেন এবং ভারত-সচিবের নির্দেশমত তাঁকে ভারতের শাসন-কার্য পরিচালনা করতে হত।

ভারত-সচিবকে পরামর্শ দান ও সাহায্য করবার জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে একটি পর্ষদ্ গঠন করা হয়েছিল। এই পর্ষদের সব সদস্যরাই ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তবে এই পর্ষদের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। ভারত-সচিব তাঁর যাবতীয় কাজের জন্য পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকতেন। গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শ দেবার জন্যেও অনুরূপ একটি পর্ষদ গঠিত হয়েছিল।

১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন

১৮৬১ সালে এই আইনটি পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের দ্বারা কেন্দ্রে একটা ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হল। এই সভার সব সদস্যই ছিলেন গভর্নর জেনারেলের মনোনীত। দেশের আইন প্রণয়ন করাই ছিল এই সভার একমাত্র কাজ। প্রথমে এই সভার সব সদস্যই ছিলেন ইংরাজ। পরে তিনজন ভারতীয়কে এই সভায় মনোনয়ন করা হয়।

এই আইনে ভারতের বড়লাটকে অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষমতার বলে পরবর্তীকালে

বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি স্বাধীনভাবে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারত না। এজন্যে বড়লাটের স্বীকৃতির প্রয়োজন হ'ত। পরবর্তীকালে ভারতীয়দের আন্দোলনের চাপে ইংরাজ সরকার মর্লে-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯), মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার (১৯১৯) এবং ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রবর্তন করে দেশ শাসন বিষয়ে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

ব্রহ্মদেশ

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের শেষে ব্রহ্মদেশের সিংহাসন দখল করে নেন মিণ্ডন। তিনি সরাসরি ইংরাজদের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তাই তাঁর আমলে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষের কোন কারণ ঘটেনি। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র থিব। তিনি এমন কতকগুলি কাজ করে বসলেন যার ফলে প্রাচ্য দেশে ইংরাজদের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ল। সুতরাং ইংরাজদের পক্ষে তখন আর যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর রইল না। লর্ড ডাফরিণ ব্রহ্মদেশে সৈন্য প্রেরণ করলেন। ইংরাজ সৈন্য প্রায় বিনা বাধায় মান্দালয় অধিকার করে নিল। থিব আত্মসমর্পণ করলেন। লর্ড ডাফরিণ এক ঘোষণা দ্বারা উত্তর ব্রহ্ম কোম্পানীর সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে নিলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ)। এইভাবে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রটিশ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

আফগানিস্তান

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইওরোপে ইংরাজদের সঙ্গে রুশদের সম্পর্ক মোটেই ভাল চলছিল না। তাই তাদের আশঙ্কা ছিল রুশরা যে কোন মুহূর্তে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে পারে। এই কারণে ইংরাজেরা তখন আফগানিস্তানের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে যাতে রুশরা আফগানিস্তানের ওপরে কোন-রকম প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এই রুশ অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্যেই এই সময়ে হিরাট ও কান্দাহার জুড়ে একটি ব্রটিশ আশ্রিতরাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের মনে উদয় হ'ল। ইতিমধ্যে তিনি কোয়েটা ব্রটিশ অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এর ফলে আফগানিস্তানের অন্যতম প্রবেশ পথ বোলান গিরিবর্ত্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হ'ল। অতঃপর লিটন কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে

এক চুক্তি করে কাশ্মীর-আফগান সীমান্তে অবস্থিত গিলগিটে একটি বৃটিশ এজেন্সী স্থাপন করলেন। আফগানিস্তানের আমীর শের আলি লিটনের এই সব কার্যকলাপকে আফগানিস্তান আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব বলে ধরে নিলেন। তাই তিনি ইংরাজদের ছেড়ে রুশদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করলে লিটন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে আফগানিস্তান পরাজিত হয়ে ইংরাজদের সঙ্গে গণ্ডামকের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পরলোকগত আমীর শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁকে আফগানিস্তানের আমীররূপে স্বীকতি দান করা হ'ল এবং তার বিনিময়ে ইয়াকুব খাঁ ইংরাজদের হাতে আফগানিস্তানের তিনটি জেলার অধিকার ছেড়ে দিলেন। নতুন আমীর ভারত সরকারের নির্দেশ-ক্রমে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করতে স্বীকৃত হলেন। কাবুলে স্থায়িভাবে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হ'ল।

সীমান্ত প্রদেশে প্রভাব-বিস্তার নীতি : গিলগিট ও তিব্বত

বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত প্রদেশে প্রভাব বিস্তার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতি অনুসরণ করেই কাশ্মীর-আফগান সীমান্তে গিলগিট অধিকৃত হয়েছিল।

তিব্বত

তিব্বতের সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুদিনের। কিন্তু কার্জন ভারতে এসে দেখলেন যে, তিব্বত ইংরাজদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের রুশপ্রীতি দেখে কার্জনের সন্দেহ হ'ল বুঝি রাশিয়ার সঙ্গে তিব্বতের কোন গোপন চুক্তি হয়ে থাকবে। তাই তিনি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড নামে এক সামরিক কর্মচারীকে একদল সৈন্য দিয়ে তিব্বতে পাঠালেন। তিনি সহজেই তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকার করে নিলেন। তখন এক চুক্তিতে তিব্বতে ইংরাজদের বাণিজ্য করবার অধিকার স্বীকৃত হ'ল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল নারীজাতির মুক্তি। এই আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত সকল কুপ্রথার উচ্ছেদ করে হিন্দুসমাজে আমূল পরিবর্তন আনবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহনের পরেই নাম করতে হয় পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। সেযুগে সমাজের মেয়েরা কিভাবে পুরুষজাতির বলি হয়েছিল এই দুই মহাপুরুষ তা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। মেয়েদের কল্যাণসাধনে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দু মাত্রেরই সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু সমাজের গোঁড়া হিন্দুদের বিরোধিতার জন্যে এই সব কুপ্রথা দূর করা সম্ভব হয়নি। তাই এ বিষয়ে আইনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

এই সময়ে সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রথা ছিল সতীদাহ। স্বামী মারা গেলে তার সদ্য বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় মৃত্যুবরণ করতে হ'ত। একেই বলে সতীদাহ। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীরা এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। প্রধানত তাঁদেরই আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে এক আদেশ জারি করে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দিলেন। এই আদেশে আরও বলা হ'ল, যে কেউ সতীদাহে সাহায্য করবে সেও নর-হত্যার অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং সেইমত সাজা পাবে।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবের ফলে বিধবাবিবাহ প্রশ্নটি শিক্ষিত মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। রাজা রামমোহন বিধবা বিবাহের সমর্থনে প্রথম লেখনী ধারণ করেন। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে প্রমাণ করে দিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লর্ড ডাল-হৌসী ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন এবং এ বিষয়ে একটি আইনও বিধিবদ্ধ হ'ল।

কিছু কিছু স্থানীয় সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ ইংরাজ সরকার স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই করেছিল। যেমন, সদ্যোজাত শিশুহত্যা নিবারণ। কোথাও কোথাও নিঃসন্তান মায়েরা মানত করে সন্তান লাভ করলে প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিত। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু জাতির মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিতে প্রচুর খরচ হ'ত। তাই মেয়ে জন্মালেই তাদের অনেকে সেই মেয়েকে আঁতুড়ে মেরে ফেলত। এই দুটি নিষ্ঠুর প্রথা যথাক্রমে ১৭৯৫ ও ১৮০২ সালে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নরবলি প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই নৃশংস প্রথাও হার্ডিঞ্জের শাসনকালে তুলে দেওয়া হয়। ১৮৪৩ সালে ভারতবর্ষ থেকে দাসপ্রথারও বিলোপসাধন করা হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের নিয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইওরোপে যত আন্দোলন ও বিপ্লব ঘটে গিয়েছে তার ইতিহাস পাঠ করে এইসব শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। তাঁরা তখন দেশবাসীর কল্যাণের জন্য শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তাঁদের মনের এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবার ভার নিল দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ। হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, মাদ্রাজের হিন্দু এবং মহারাষ্ট্রের মারাঠা ও কেশরী নির্ভিকভাবে সরকারী নীতির সমালোচনা করে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষিত সমাজের তখন একমাত্র কাম্য ছিল দেশের শাসন-কার্যে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু ইংরাজ সরকার এঁদের আশা ভরসা পূরণ করবার জন্য কিছুই করলেন না। এইজন্যে তখনকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মিলে 'ভারতসভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'ভারতসভা' এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে সুরেন্দ্র-নাথ ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট জনমত গড়ে তুললেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে অচিরেই এটা এক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হ'ল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ সালে হিউম নামে এক সদাশয় ইংরাজ বড়লাট ডাফরিণের সমর্থন নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্যের সুবিধার জন্য একটি জনমতের মুখ-পাত্র গঠন করা। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে বিশিষ্ট ভারতীয়দের নিয়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সঙ্গে এর বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। তাই সুরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তখন থেকে কংগ্রেসই হ'ল আমাদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ হয় সেরকম কোন ইচ্ছা প্রথম প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের কারুরই ছিল না। তাই তাঁরা প্রয়োজনমত সরকারী নীতির সমালোচনা করতেন

এবং ভারতীয়দের হাতে কিছু কিছু শাসনভার ছেড়ে দেবার জন্যে সরকারের কাছে অনুরোধ জানাতেন।

চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫—১৯১৪)

কিন্তু বার বার আবেদন-নিবেদন করেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না দেখে কংগ্রেসের মধ্যে একদল বামপন্থীর উদ্ভব হল। সেই সব বামপন্থী নেতারা আবেদন-নিবেদন এবং সভাসমিতি করার চেয়ে আরও সক্রিয় কোন পন্থা অবলম্বন করবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এঁদের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, বাংলার শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। ইংরাজদের কাছে কোনরকম আবেদন-নিবেদন না করে সমগ্র দেশবাসীর সাহায্যে আন্দোলন চালিয়ে ইংরাজদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াই ছিল এই নতুন দলের উদ্দেশ্য।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ঃ

শিক্ষিত বাঙালীর মনে বহুদিন থেকে অপূর্ব দেশপ্রেম জেগে উঠেছিল। তাই সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশেই এই জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম আগে বাংলা-দেশের সঙ্গে একত্র ছিল। বড়লাট লর্ড কার্জন দেখলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ আধাআধি হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত হলেও তারা এক জাতি—তারা বাঙালী। তিনি ভাবলেন, এই দুই সম্প্রদায়কে পৃথক্ করতে পারলে বাঙালী হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া উভয়কেই জর্জরিত করবে। এই উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন যে, বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি প্রদেশে ভাগ করা হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ হ'ল, এর নাম হল বঙ্গদেশ। পূর্ব ও উত্তর বাংলা এবং আসাম নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠন করা হ'ল। বাংলাদেশ তখন জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে। নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করে জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করাই বঙ্গভঙ্গের আসল উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালী হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে রাজী হল না। প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার দিন স্থির হল ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্‌টোবর। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল

হল না দেখে সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রকাশ্যে "বয়কট" বা বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করলেন। কিছুদিন পরে টাউন হলের বিরাট জনসভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে 'বয়কট' আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বিরাট জনসভা আহ্বান করে বিলাতী বস্ত্র, লবণ, চিনি ও মনোহারী সামগ্রী বর্জন করবার জন্যে সকলকেই উৎসাহিত করা হতে লাগল। একাজে প্রধান সহায় হ'ল স্কুল-কলেজের বালক ও যুবকেরা।

সশস্ত্র বিপ্লব

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার কর্ম-পন্থায় একদল অতি উগ্রপন্থী মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ইংরাজদের ভারত ছাড়া করতে। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লেও বাংলা ও পাঞ্জাবই ছিল বিপ্লব আন্দোলনের মূল ঘাঁটি। বাংলাদেশে অরবিন্দ ঘোষই বিপ্লব আন্দোলনের জনক। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের প্রবর্তনে ভগিনী নিবেদিতারও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯০৫ সালে ঢাকার অনুশীলন সমিতির পত্তন করেন পি. মিত্র। এই দলের কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে বারীন্দ্রকুমার কলকাতায় মাণিক-তলার এক বাগান বাড়ীতে এক গুপ্ত বোমার কারখানা স্থাপন করলেন। এই দলেরই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুই কিশোর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে দুজন নিরপরাধ ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করে বসল। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হ'ল আর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহচরেরা সবাই ধরা পড়ে গেলেন। কেবল অরবিন্দ ছাড়া আর সবাই বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বে-আইনী বলে ঘোষিত হল। তারপর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় এবং তার ফলে বহু লোকের—কারুর ফাঁসী, কারুর বা দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ইতি-মধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবের জন্য প্রচার, অস্ত্র সংগ্রহ, বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন প্রভৃতি কাজের জন্যে ভারতের অনেক বিপ্লবীই তখন বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রের অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করতে থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেস থেকে ১৯১৪ সালের ইওরোপীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম অবদান উগ্র জাতীয়তাবাদকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। নিজের জাতি আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এই ধারণা অপর জাতির ওপর আধিপত্য স্থাপনের স্পৃহাকে প্রবল করে তুলেছিল। এই সময়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক—এই ধারণা ইওরোপের সব জাতির মধ্যে ক্রমেই বদ্ধমূল হতে থাকে। ইওরোপের সর্বত্র সমর উপকরণ ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির আয়োজন চলতে থাকে। এই প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র ইওরোপ যেন এক বারুদের স্তূপে পরিণত হ'ল। এইরকম পরিস্থিতিতে অগ্নি সংযোগের পক্ষে যেকোন ক্ষুদ্র ঘটনাই যথেষ্ট ছিল।

এই উগ্র জাতীয়তা বাস্তবে প্রকাশ পেতে থাকে ভিন্ দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রসর হয়ে এই প্রাধান্য অনেকখানি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালী এ ব্যাপারে কিছু বিলম্বে যাত্রা শুরু করে বলে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে স্বভাবতই তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়।

আহত জাতীয়তাবোধ এবং অতৃপ্ত জাতীয় আকাঙ্ক্ষাও ইওরোপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। সেডানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেণ প্রদেশ দুটি ত্যাগ করতে হয়েছিল। সে শোক ফ্রান্স কোনদিন ভুলতে পারেনি। স্বভাবতই ঐ দুটি প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করার আশা ফ্রান্স ছাড়তে পারল না। ফলে ফরাসী জাতির মনে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেলে লাগল।

১৮৭০ সালে ইতালীর ঐক্য সম্পন্ন হলেও ট্রেন্টিনো ও ট্রিয়েস্ট—এই দুটি অঞ্চল তখনও ছিল অস্ট্রিয়ার অধীন। সুতরাং ঐ দুটি অঞ্চল ইতালীর সঙ্গে সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইতালীবাসীর জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। তাই সেই জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করবার জন্য ইতালীতে ক্রমেই যুদ্ধের মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বলকান অঞ্চল তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। সেখানে শ্লাভরাষ্ট্র সার্বিয়া ঐ অঞ্চলের শ্লাভজাতি অধ্যুষিত স্থানগুলি একত্র করে একটা বড় শ্লাভরাষ্ট্র গড়ে তোলার আশা পোষণ করত। বসনিয়া ও হার্জিগোভিনার অধিবাসীদের সঙ্গে সার্বিয়ার অধিবাসীদের জাতিগত ও ভাষাগত মিল ছিল। তাই তারা সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি কামনা করত। কিন্তু ইওরোপের কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে ঐ দুটি প্রদেশ অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে রেখে দিলেন। পরে অস্ট্রিয়া রসনিয়া ও হার্জিগোভিনাকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়ার ফলে সার্বিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এই বিরোধে রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করতে লাগল। এইভাবে বলকান অঞ্চলে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এক জটিল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। এই সময়ে জার্মানী তুরস্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত সরাসরি এক রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু এই জার্মান পরিকল্পনা ছিল ইংরাজদের স্বার্থবিরোধী। তার ওপর জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধি ইংলণ্ডের পক্ষে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল। এইভাবে ধীরে ধীরে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও জার্মানী ক্রমে ইংলণ্ডের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

বিসমার্ক জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালীকে নিয়ে এক ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রত্যেকেই এককভাবে থাকবার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। তাই তারা নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলে বিসমার্কের ত্রিশক্তি চুক্তির পাল্টা এক ত্রিশক্তি মৈত্রী গড়ে তুলল। এভাবে সমগ্র ইওরোপ একদিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী এবং অন্যদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। উভয় শিবিরেই তখন যুদ্ধের জন্য জোর প্রস্তুতি চলতে থাকে।

এইভাবে ইওরোপে যখন বারুদের স্তূপ জমে উঠেছে তখন অকস্মাৎ একটি ঘটনায় তাতে আগুন ধরে গেল। অস্ট্রিয়ার অধীন বসনিয়া প্রদেশে ছিল সার্বজাতির বাস। পাশেই সার্বদের স্বাধীনরাজ্য সার্বিয়া। বসনিয়ার সার্বরা তখন মুক্তি আন্দোলন চালাচ্ছিল। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরানী বসনিয়ার রাজপথে এক সার্ব বিপ্লবীর হাতে নিহত হলেন। এই কারণে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়া আক্রান্ত হলে রাশিয়া সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিল। রাশিয়া জার্মানীর অনুরোধে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ না রাখায় জার্মানী ১৯১৪ সালের ১লা আগস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করল। তার দুদিন পরে অর্থাৎ ৩রা আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী যখন বেলজিয়ামের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে ইওরোপের প্রায় সব কয়টি বড় বড় রাষ্ট্র এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইওরোপের বাইরে জাপান ও আমেরিকাও এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে লড়াই করেছিল। দীর্ঘ চার বছর যুদ্ধের পর জার্মানী বিনা শর্তে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ভীষণতা

চার বছর ব্যাপী এই মহাযুদ্ধ ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এর আগেও দেশে দেশে বহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেছে। কিন্তু সেসব যুদ্ধে এতগুলি দেশ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি এবং এই সংহার-যজ্ঞের সঙ্গে আগের কোন যুদ্ধের তুলনাই হয় না। ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত আর রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত ছিল আসল যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু যুদ্ধের দাবানল ইওরোপ ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছিল মেসোপটেমিয়া, চীন, আফ্রিকা এমন কি উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত। শুধু জলে-স্থলে নয়, আকাশে এবং জলের নীচেও সংঘর্ষ চলেছে। আকাশে বিমান উড়ে নীচে শহর এবং সৈন্য শিবিরের ওপর সর্বনাশা বোমা ফেলেছে। সমুদ্রের নীচে থেকে ডুবোজাহাজ টর্পেডো ছেড়ে ওপরের জাহাজ ডুবিয়েছে। ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির প্রয়োগে মুহর্তে হাজার হাজার শত্রু নিপাত করবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে এই যুদ্ধে। সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ কেটে তার মধ্যে আত্মগোপন করে শত্রুর ওপর গুলিবর্ষণ করত। আধুনিক বিজ্ঞান সংহার যন্ত্রের কতখানি উন্নতি করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পরীক্ষা হয়ে গেল। এই যুদ্ধে কত ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়েছে তার কোন হিসেব নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী দেশসমূহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। একদিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী। পরে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এদের সঙ্গে যোগ দেয়। এদের মধ্যে ইতালী আবার যুদ্ধ চলাকালে জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করে বিরোধী দলে যোগদান করে।

এই সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। যুদ্ধের সময় এদের নাম হয় মিত্রশক্তি। পরে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দেয় বেলজিয়াম, সার্বিয়া ও ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক দেশ, যথা—ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এক বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের পর রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে এক সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। সেই সঙ্কট মুহূর্তে আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। দূরপ্রাচ্যে জাপানও ছিল ইংলণ্ডের মিত্রশক্তি। চীনও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এর ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই এই যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। এর আগে এমনটি কখনও হয়নি। তাই এই যুদ্ধকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল। জাতীয়তাবাদ নীতি প্রয়োগের ফলে প্রাচীন রুশ সাম্রাজ্য থেকে জন্ম নিল চারটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র—ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া এবং লিথোনিয়া। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়ে পোল্যাণ্ড আবার তার আগেকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর রাজ্য থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হ'ল।

গণতন্ত্রের প্রসার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল। যুদ্ধের পর গণতন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে রাশিয়া, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া থেকে তিনটি প্রাচীন রাজবংশ উচ্ছেদ হয়ে গেল। জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ায় গৃহীত হল গণতান্ত্রিক সংবিধান আর রাশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলশেভিক ধারার সঙ্গে মিশে গেল। গণতন্ত্রের প্রভাবে তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীল সুলতানী শাসনের অবসান ঘটল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল আন্তর্জাতিকতার প্রসার। প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধের পর জাতিসংঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রত্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর অবদান চিল সবচেয়ে বেশি। তাই যুদ্ধ শেষে স্বভাবতই তারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। ক্রমে তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ইওরোপের রাজনীতিতে এক নবযুগের সূচনা করল।

ইংরাজদের সমর প্রচেষ্টায় ভারতের সাহায্যদানের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের নিজস্ব কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। এই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল প্রধানতঃ ইওরোপীয় জাতিগুলির স্বার্থ সংঘাতের ফলেই। শক্তিমান দেশগুলি নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে বা আরও বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে নেমেছিল। আর যেসব দেশ তখনও পরাধীন তারা যুদ্ধ করেছিল নিজেদের মুক্তি কামনায়। ভারত ছিল ইংরাজদের একটি উপনিবেশ। বিদেশী শাসককুলের চাপে পড়েই ভারতকে এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তখনও নরমপন্থী নেতাদের প্রভাব ছিল অটুট। শিক্ষাদীক্ষায় তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরাজপন্থী। ইংরাজদের এই চরম দুর্দিনে তাঁরা বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে স্বভাবতই কুণ্ঠাবোধ করলেন। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইংরাজদের নানাভাবে সাহায্যদানের জন্য এগিয়ে আসেন। তাছাড়া তাঁরা আশা করেছিলেন যে, এই উদার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ইংরাজরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবির অন্ততঃ কিছুটা পূরণ করবেন। এই কারণে ১৯১৫ সালের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আর্থিক দুর্দশা—জনসাধারণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি

বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ফলে ভারতবাসীর লাভের তুলনায় লোকসানই হয়েছিল বেশি। প্রায় বার লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ইওরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও চীনের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরাজদের পক্ষে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য ভারতের তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। দেশের মানুষের ওপর নতুন নতুন কর স্থাপন করে এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়। ফলে করভারে জর্জরিত চাষীমজুর প্রভৃতি নিম্নবিত্তশ্রেণীর মানুষের দুর্দশার সীমা রইল না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন—তেল, নুন, মশলা, কেরোসিন, জামা-কাপড়ের দাম অসম্ভব বেড়ে গেল। যুদ্ধের শেষ বছর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও প্লেগের আক্রমণে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়। দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এইসব নানা কারণে নিম্নবিত্তশ্রেণীর মানুষের মনে অস্থিরতা ও অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষিত মানুষের

সঙ্গে চাষী, শ্রমিক, মজুরদেরও স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল হতে দেখা যায়।

দেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি আলিপুরের বোমার মামলায় ধৃত বিপ্লবীদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবীদের প্রধান প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতিও বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু তাতেও ভারতে বিপ্লব আন্দোলনে কোন ভাঁটা পড়েনি। বঙ্গভঙ্গের পর পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এঁদের নেতৃত্ব দেন সর্দার অজিত সিং, লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ। লালা লাজপত রায় এঁদের গোপনে সাহায্য করতেন।

এই সময় ভারতেব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ধারণা হয় যে বঙ্গভঙ্গই দেশে যত অশান্তির মূল। কাজেই বঙ্গভঙ্গ রদ করলেই এই অশান্তির নিরসন ঘটবে। তাঁর পরামর্শ মত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হ'ল। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীরাই নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। তাই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হ'ল।

বঙ্গভঙ্গ রোধ করলেই বিপ্লব আন্দোলনের অবসান ঘটবে—হার্ডিঞ্জের এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। ১৯১২ সালে দিল্লীর রাজপথে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। অল্পের জন্য বড়লাট প্রাণে বেঁচে যান। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পাঞ্জাব থেকে মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ব বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত এক সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ষড়যন্ত্রটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯০৮ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বাংলায় অসংখ্য রাজনৈতিক ডাকাতি ও বহু অস্ত্রচুরির ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে প্রধান ছিল কলকাতায় রডা কোম্পানীর বন্দুক ও কার্তুজ চুরির ঘটনা। ১৯১০-১১ সালে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিনায়ক সাভারকারের এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাসের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

বিপ্লবের জন্য প্রচার, অস্ত্র সংগ্রহ, বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন প্রভৃতি কাজের জন্য ভারতের অনেক বিপ্লবীই তখন বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। পাঞ্জাবের লালা হরদয়াল আমেরিকায় গদর পার্টির পত্তন করেন। তাঁরা জার্মানীর অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

নেতৃত্বে বাংলাদেশে আর একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি পরে মানবেন্দ্র নাথ রায় নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। জার্মান সরকারের সাহায্যে ভারতে অস্ত্র আমদানির উদ্দেশ্যে তিনি দুবার জার্মানীতে গিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল ম্যাভেরিক নামে একটি জার্মান জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উড়িষ্যার মহানদীর তীরে পৌঁছে বিপ্লবীদের হাতে তা তুলে দেবে। সেই অস্ত্র গ্রহণ করতেই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু পুলিশ খবর পেয়ে তাঁদের অনুসরণ করে। বিপ্লবীরা তখন উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে বুড়ীবালামের তীরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চার জন বিপ্লবীর একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং বাকী তিন জন গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। বাঘা যতীন পরে হাসপাতালে মারা যান।

অপরদিকে পুলিশের তৎপরতায় বিপ্লবীদের লাহোর ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন রাসবিহারী বসু। ধরাপড়ার আশঙ্কায় তিনি ছদ্মবেশে জাপানে চলে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বসু টোকিওতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই সময়েই সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সুভাষচন্দ্র রাসবিহারী বসুর কাছ থেকেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

হোমরুল আন্দোলন

১৯১৬ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটে। তখন কংগ্রেসের মধ্যে তিলক এবং এ্যানি বেসান্তের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এঁরা দুজনে তদানীন্তন কংগ্রেসকে শক্তিহীন বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা তখন জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য এক প্রাণবন্ত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল লীগের অনুকরণে ভারতে একটি হোমরুল লীগ স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল হোমরুল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন শিক্ষিত জনগণের মধ্যে এক বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ভারত সরকার এই আন্দোলন দমন করার উদ্দেশে দমন নীতি প্রয়োগ করে নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতা কমানো গেল না।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইসলাম জগতের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে তুরস্কের বিদ্রোহী অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে বৃটিশ সরকার সহায়তা করায় ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সংঘবদ্ধভাবে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। মহম্মদ আলি জিন্না এ বিষয়ে অগ্রণী হন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি দ্বারা স্থির হ'ল যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে সরকারের কাছে শাসন সংস্কারের দাবি পেশ করবে। এই চুক্তিতেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের 'স্বরাজ আদর্শ' মেনে নিয়েছিল। এই চুক্তি জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রেরণা যোগায় এবং তা সরকারের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে।

মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার

কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করা আর সেই সঙ্গে হোমরুল আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে ভারতসচিব মন্টেগু ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে ভারতীয়রা যাতে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করতে পারে, বৃটিশ সরকার সেই নীতি গ্রহণ করেছেন। সেই সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন চেম্‌স্‌ফোর্ড। ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার আইন পাশ হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও আয় সুনির্দিষ্ট ভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদে তিনজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয়। এই আইনে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হলেও দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। এই সময়ে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের আধিপত্য ছিল। তাই নরমপন্থী নেতারা এই সংস্কারকে স্বাগত জানালেও চরমপন্থী নেতারা একযোগে ঘোষণা করলেন যে, এই সংস্কার আইন কোনক্রমেই গ্রহণ-যোগ্য নয়।

রাওলাট আইন

যুদ্ধের সময় সবরকম বিপ্লবী কার্যকলাপ দমন করার জন্য ভারতে প্রতিরক্ষা আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। তবুও ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার বৃটিশ সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সেই সময়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের তোড়জোড় চলছিল। সুতরাং সেই জাতীয়তাবাদী আন্দো-

লনের মোকাবিলা করার জন্য ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুখ্যাত রাওলাট আইন পাশ করা হয়। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং যথেচ্ছভাবে বিনাবিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব গ্রহণ

এই সময় তিলক ছিলেন বিদেশে। কাজেই শাসনমূলক এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের ভার পড়ল গান্ধীজীর ওপর। তিনি বোম্বাইয়ের এক জনসভায় সকলকে শপথ নিতে বললেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাওলাট আইন প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন পর্যন্ত তাঁরা শান্ত ও সংযতভাবে এই আইন অমান্য করবেন। গান্ধীজী এই আইনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন। তিনি এই দিনটিকে জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯২০ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সর্বভারতীয় নেতারূপে গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

দেশের সর্বত্র রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার চরম পরিণতি ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯)। ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবের দুই জনপ্রিয় নেতা ডঃ সত্যপাল ও কিচলুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অমৃতসর শহরে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেই শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে কিছু লোক নিহত হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অমৃতসর শহরে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রসিদ্ধ উদ্যানে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। আগের দিন জেনারেল ডায়ার অমৃতসরের শাসনভার গ্রহণ করে শহরে সভাসমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রায় দশহাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল জালিয়ান-ওয়ালাবাগ উদ্যানে। ডায়ারের নির্দেশে সেনাবাহিনী সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর দশমিনিট ধরে অবিরাম গুলি চালায়। ফলে সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারায়। এই দুঃসংবাদে সারা ভারতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় অবমাননার প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেন।

খিলাফৎ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও তার মিত্রপক্ষ সকলেরই পরাজয় হয়। তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে যে সন্ধি হয় তার শর্ত অনুসারে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং আরব দেশের ওপর সুলতানের আধিপত্য লোপ পায়। এমনকি তুরস্কের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তখন ভারতীয় মুসলমানদের ধারণা হ'ল যে, ইওরোপের খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি একত্র হয়ে মুসলমানদের ধর্মগুরু খলিফার (তুরস্কের সুলতান) মানসম্ভ্রম নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। তাই ইংরাজদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে খলিফার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তারা আন্দোলন শুরু করে দেয়। ইতিহাসে এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। গান্ধীজী এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে একত্র হয়ে তিনি মুসলমান নেতাদের তাঁর পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁরা গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হলেন। এইভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী এক বৃটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠল। সারা ভারতের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে গান্ধীজী জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

সমাজতন্ত্রবাদ

১৯১৭ সালে রাশিয়াতে একটি খুব বড় বিপ্লব হয়। এর ফল ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। শিল্প বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সমাজে দুটি অসম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। একদল ধনী —সমস্ত রকম জমিজমা, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির মালিক; আর এক দল—গরীব, জমিজমাহীন, শ্রমজীবী মজুর ও কৃষক—সমস্ত রকম সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত। উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী সমাজ জীবনে এই বিরাট পার্থক্যের প্রতিকারের জন্যে নানারকম গভীর চিন্তাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করে গিয়েছেন। ক্রমে এইসব মতবাদকে কেন্দ্র করে এক নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়। তার নাম "সমাজতন্ত্রবাদ"। এর মূল কথা হ'ল জমিজমা, কলকারখানা প্রভৃতিতে কারও কোন ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকবে না। এ সবের মালিক হবে রাষ্ট্র এবং এ থেকে যে আয় হবে তাতে সকলের সমান অধিকার থাকবে।

কার্ল মার্কস্

সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মধ্যে কার্ল মার্কসই সবচেয়ে বিখ্যাত। দুঃখজর্জরিত শ্রমিক ও কৃষকেরা কি উপায়ে তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে তাই উদ্ভাবন করবার জন্যে তিনি জীবনপাত করে গেছেন। তাঁর মতামত ব্যক্ত করে তিনি অনেক বই লিখেছিলেন। মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, বর্তমান সমাজ,—যে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিক, জমিদার ও কারখানার মালিক প্রভৃতিই সবচেয়ে শক্তিশালী—সেই সমাজের একদিন পতন হবে। সেই জায়গায় শ্রমজীবী মজুর ও কৃষকেরা শক্তিশালী হয়ে সমাজ ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। তখন ক্রমে শ্রেণীগত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে এবং দেশের সমস্ত ধন ও ধন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিক হবে দেশের আপামর জনসাধারণ। রুশ বিপ্লবের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা মার্কসের মতবাদকেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সার্থক করবার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁরা দুনিয়ার মজদুরকে এক হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া

প্রায় চল্লিশ বছর আগেও ইওরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশ জাতি অনেক বিষয়ে অনুন্নত ছিল। মধ্যযুগের জমিদারদের মত তখন

রাশিয়ার অভিজাত বংশের লোকেরা রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্তরকম সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। এঁদের সকলের ওপরে ছিলেন রাশিয়ার সম্রাট। তাঁর উপাধি ছিল "জার"। রাজবংশের ও অভিজাতদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সেনাবাহিনী ও গুপ্ত পুলিসের সাহায্যে যথেচ্ছভাবে রাজ্যশাসন করতেন।

রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষক। তারা ছিল অত্যন্ত গরীব এবং অশিক্ষিত। শিল্প উৎপাদনেও রুশরা বিশেষ অগ্রণী ছিল না। দেশে যা কিছু শিল্প উৎপাদন করা হ'ত তার মূলধন জোগাত বিদেশী ধনিকেরা। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল কৃষকদের মতই শোচনীয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তারা বাস করত এবং সামান্য মজুরী দিয়ে তাদের খাটিয়ে নেওয়া হ'ত। কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির প্রতি শাসকদের কোনরকম দৃষ্টি ছিল না।

শাসন সংস্কারের আন্দোলন

গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ প্রভৃতি রাশিয়ার কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের দুরবস্থা এবং জারের স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমে রাশিয়ার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে কতকগুলি উদারপন্থী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে একটি দল ছিল মার্কসের মতবাদী। তাদের নাম বলশেভিক। এরাই পরে কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী বলে পরিচিত হয়। এই দলের নেতা ছিলেন লেনিন। তাঁরই নেতৃত্বে বহু আন্দোলনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার করা হয় বটে কিন্তু তাতে জারের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হ'ল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু জার্মানীর আক্রমণে তারা ভীষণভাবে পরাজিত হতে থাকে। যুদ্ধের এইরকম শোচনীয় ব্যর্থতা এবং খাদ্যের অভাবের জন্য দেশে ভয়ানক অশান্তি দেখা দিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা ও শহরে শ্রমিকেরা সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করল। যে সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করে জার তাঁর শাসনকার্য চালাতেন তারাও খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে দলে দলে এসে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যোগ দিল। জারের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব হওয়াতে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব শুরু হয়েছিল।

বলশেভিকদের ক্ষমতালাভ

এবার স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের পরিবর্তে একটি উদারপন্থী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হল। তখন দেশের নেতা হলেন কেরেন্‌স্‌কি। এদিকে রাজধানী পেট্রোগ্রাদ (এখনকার লেনিনগ্রাদ) এবং অন্যান্য শহরের শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে স্থানীয় পরিষদ (সোভিয়েৎ) গঠন করেছিল। এইসব পরিষদে বলশেভিকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা শান্তি স্থাপন, জমিজমার পুনর্বন্টন ও খাদ্য সরবরাহের জন্য আন্দোলন শুরু করল। কিন্তু নতুন শাসকেরা এই দাবি পূরণ করতে পারলেন না। কাজেই তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

দেশ জুড়ে যখন এইরকম একটা বিরাট অশান্তিময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তখন জার্মান সেনাবাহিনী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে পেট্রোগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হল। এই নতুন পরাজয়ের ফলে এবার দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই সময়ে লেনিন ফিরে এসে তাঁর দুই সহযোগী ট্রট্‌স্কী ও স্ট্যালিনের সাহায্যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে নেন। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর এই বিপ্লব হয়েছিল বলে আজও রুশরা এই দিনটিকে বিপ্লবের দিন হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে।

এইভাবে বিপ্লবী নেতারা সংযুক্ত সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা করলেন। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি কিন্তু রাশিয়ার এই বলশেভিক সরকারকে স্বীকার করতে চাইল না। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাও বলশেভিকদের উচ্ছেদ করবার জন্যে বিদেশী কয়েকটি দেশের সহায়তায় যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু ট্রটস্কীর নেতৃত্বে পরিচালিত "লাল ফৌজের" সামনে এরা কেউই দাঁড়াতে পারল না। এই-ভাবে বলশেভিকরা রাশিয়াকে সমস্তরকম বিপদ থেকে মুক্ত করে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করে।

রুশবিপ্লবের কারণ

রুশ বিপ্লবের কারণগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) রাজনৈতিক; (২) অর্থনৈতিক এবং (৩) সামাজিক।

রাজনৈতিক কারণ

জারের স্বেচ্ছাচারী শাসনে দেশের মানুষের জীবন দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোত রাশিয়ায় এসে পৌঁছলে সেখানকার শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ জারদের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

জানাতে শুরু করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তখন সমস্বরে শাসন-সংস্কারের দাবি করতে থাকে। কিন্তু জার তাদের কথায় কর্ণপাত না করে দমনমূলক আইন ও কঠোর নির্যাতনের দ্বারা এই গণ-আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হলেন। ফলে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা আরও বেড়ে গেল।

১৯০৫ সালে জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে দেশে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। কলকারখানায় ধর্মঘট এবং গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। অবশেষে সৈন্যদলের মনেও এই বিদ্রোহী মনোভাবের ছোঁয়া লাগে। তখন জার বাধ্য হয়ে দেশের এক প্রতিনিধি সভা (ডুমা) আহ্বান করলেন। কিন্তু ডুমায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা স্থান পেলেন না। তাই সাধারণ মানুষের অসন্তোষ তাতে বিন্দুমাত্র কমল না।

এই সময়ে জারের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রানীর প্রিয়পাত্র রাসপুটিন নামে একজন যাজকের হাতে। তিনি তখন দোর্দণ্ড প্রতাপে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুর্নীতি ও অনাচারের পঙ্কিল স্রোতে রাশিয়ার অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্গীন। ঐরকম শোচনীয় অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে রাশিয়া নিজেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলল। জার্মান সৈন্যের আক্রমণে হাজার হাজার রুশ সৈন্য অসহায়ের মত মৃত্যুবরণ করতে লাগল। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে শহরাঞ্চলে নিদারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। দেশে চরম খাদ্যাভাব, তার ওপর শ্রমিকরা আবার ধর্মঘট করে বসল। তখন আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেওয়া হলে সৈন্যরা তা করতে অস্বীকার করে। অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল জোর করে ক্ষমতা অধিকার করে নেয়।

অর্থনৈতিক কারণ

রাশিয়ার অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল তখন বিদেশী। শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর লোকবল ও শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখা দেয় কৃষিকার্যে চরম অবহেলা। সুতরাং দেশের আর্থিক অবস্থায় এই যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হল তাতে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

সামাজিক কারণ

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সমস্যাবলী রাশিয়ার সমাজ-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। রুশ সমাজে তখন দুটি শ্রেণী—একটি অভিজাত শ্রেণী এবং অন্যটি ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী। ভূমির মালিকানা স্বত্ব ছিল অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারে। যদিও ১৮৬১ সালে সার্ফদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তবুও তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির স্বত্ব ভোগ করবার কোন অধিকার গ্রাহ্য করা হয়নি। এই কারণে কৃষকদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশার অবধি ছিল না। তাই তাদের মনে তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল—এ কি ধরনের মুক্তি? তাই তারা সর্বদাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে।

কৃষকদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের মিলন—শ্রমের সঙ্গে বুদ্ধির মণিকাঞ্চন যোগরূপে দেখা দিল। রাশিয়ার বহু সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের সম্মিলিত সাধনা দেশে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। পুস্কিন, ডসটয়েভ্স্কি, চেখভ, গোর্কি, তুর্গেনিভ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনায় সমাজের অভিজাতশ্রেণীর অনাচার ও সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠছিল। এইসব রচনা দেশের জনসাধারণের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিল।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব

ফরাসী বিপ্লবের পর যেমন ইউরোপের সর্বত্র সেই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে, সেইরকম রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ বিপ্লবের ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রুশ বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক, কৃষক ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মনে মুক্তির যে আশা জেগেছিল তা আজও জাগ্রত আছে। রুশ বিপ্লবের ভাবধারাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শোষিত, নির্যাতিত মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। বিপ্লবী রুশ সরকার নিপীড়িত জাতিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রেরণা ও সাহায্য দিয়ে থাকে। আজ পৃথিবীর বহু দেশে রাশিয়ার আদর্শে সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ বিভিন্ন দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারত, তুরস্ক, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ রুশ আদর্শে নিজের নিজের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সুফল পেয়েছে।

রাশিয়ার সাম্যবাদী সংস্কারগুলি আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ

বিভিন্নভাবে গ্রহণ করছে। রাশিয়ার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা, কল-কারখানা ও ক্ষেতখামারগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার ফলে মালিকদের পক্ষে শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ করা আর সম্ভব হয় না। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি পেয়ে থাকে। রাশিয়ার আদর্শে ভারত প্রভৃতি অনেক দেশ লোহা, ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছে। উন্নয়নশীল সব দেশই এখন রাশিয়ার আদর্শে মূল শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে আনার ব্যবস্থা করছে। রাশিয়ার আদর্শে শ্রমিকের কল্যাণের নীতিও অনুসরণ করা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। রুশ বিপ্লবের ফলে দুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের যে জাগরণ ঘটেছে তা দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়—একথা আজ অধিকাংশ রাষ্ট্রই বুঝেছে। তাই ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারও এখন শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য কল্যাণমূলক আইন রচনা করে থাকে।

সাম্যবাদী রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি যতই অপপ্রচার চালাক না কেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে রুশ বিপ্লবের আদর্শ আজ বহু দেশ উপলব্ধি করেছে। পূর্ব ইওরোপ, চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী সরকার স্থাপিত হয়েছে। ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করে সোভিয়েত রাশিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজও পৃথিবীর শোষিত, নিপীড়িত জনগণের কাছে রুশ বিপ্লবের আদর্শই একমাত্র ভরসা।

চতুর্দশ অধ্যায়

ইওরোপ (১৯১৯—১৯৩৯)

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন

চার বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করার ফলে জার্মানীর শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। জার্মানরা যখন বুঝতে পারল যে, জয়ের আর কোন আশা নেই, তখন তারা ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে বাধ্য হয়ে আত্ম-সমর্পণ করল। এই দিনটি প্রায় কুড়ি বছর ধরে যুদ্ধবিরতি দিবস হিসাবে পালন করা হত।

অতঃপর ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা সন্ধির শর্তসমূহ আলোচনার জন্য প্যারিসে সমবেত হলেন। সম্মেলনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালী ও জাপান এই পাঁচটি রাষ্ট্রের মোট দশ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হ'ল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্মেলনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন চার প্রধান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী লয়েড জর্জ, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্সো এবং ইতালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডো।

ভার্সাই শহরে অনেকগুলি বৈঠক ও সভা সমিতির অধিবেশনের পর বিজয়ী ও পরাজিত দেশগুলির মধ্যে মোট পাঁচটি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়,—(১) জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাইয়ের চুক্তি, (২) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট জার্মানের চুক্তি, (৩) হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়ানলের চুক্তি, (৪) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির চুক্তি এবং (৫) তুরস্কের সঙ্গে সেভরের চুক্তি।

শান্তি চুক্তি'র নীতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে বিজয়ী রাষ্ট্রের অধিকাংশ নেতার বক্তৃতায় জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। যুদ্ধের জন্যে তাঁরা জার্মানীকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করলেন আর সেই সঙ্গে দাবি করলেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে সে আর ভবিষ্যতে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সম্মেলনের আলোচনায় একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনই ন্যায়বিচার, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শে জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়ো-জনীয়তা সম্পর্কে সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতিকে অনুসরণ করেই শান্তি চুক্তিগুলি রচনা করা হয়। (১) জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করা; (২) ভবিষ্যতে জার্মানী যাতে পুনরায় ইওরোপে শান্তিভঙ্গ করতে না পারে তার ব্যবস্থা

করা, (৩) জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া; (৪) ইওরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখা; (৫) উইলসনের ভাবধারা অনুযায়ী জাতীয়তাবাদকে রূপায়িত করা; (৬) ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং (৭) ইওরোপে রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্র রক্ষা করা।

ভার্সাইয়ের সন্ধি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে যে সব সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাদের মধ্যে জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাইয়ের সন্ধিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলেছি এই সন্ধির পেছনে বিজয়ী শক্তিবর্গের একটাই উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হ'ল জার্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া। তাই ভার্সাইয়ের সন্ধিতে ইওরোপের মানচিত্রকে আবার নতুন করে আঁকা হয়েছিল। প্রত্যেক জাতির লোকদের পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলবার অধিকার আছে—এই মহান্ নীতিকে এই সময়ে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই নীতি অনুসারেই জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোল্যাণ্ডকে একটি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। জার্মান সাম্রাজ্য থেকে বেশ কিছু অংশ কেটে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সন্ধি অনুসারেই জার্মানী আলসাসলোরেন ফ্রান্সকে, ইউপেন, ম্যালমেডি ও মরিসনেট বেলজিয়ামকে, শ্লেজউইগ ডেনমার্ককে এবং মেমেল বন্দর লিথুয়ানিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ জার্মানীর সার উপত্যকা ১৫ বছরের জন্যে ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হয়। পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে জার্মানীর যেসব উপনিবেশ ছিল সেগুলি জাতিসংঘের পরিদর্শনাধীনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ'ল।

জার্মানী যে কেবল তার কতকগুলি রাজ্যখণ্ড ও উপনিবেশ হারাল তাই নয়। ভবিষ্যতে যাতে জার্মানী আবার শক্তিসঞ্চয় করে ইওরোপের শান্তি বিপন্ন করতে না পারে সেজন্যে তার সামরিক ও আর্থিক ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হ'ল। জার্মানীকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে, তার সৈন্যবাহিনীতে এক লক্ষের বেশি সৈন্য থাকবে না, জার্মানী সৈন্য সংগ্রহের জন্যে বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্তন করতে পারবে না এবং তার নৌবহর ইংলণ্ডকে সমর্পণ করতে হবে। এছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানীর ওপর প্রচুর অর্থ দানের দায়িত্ব চাপান হয়েছিল। ভার্সাই সন্ধিতে ঘোষণা করা হ'ল যে জার্মানীই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। পৃথিবীতে শান্তিরক্ষাকল্পে জাতিসংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত এই সন্ধিতেই গৃহীত হয়েছিল।

ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালীকে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল সেই তুলনায় প্যারিসের শান্তি-চুক্তি অনুসারে সে যা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছিল তাকে যৎসামান্যই বলা চলে। ফলে সারা দেশে এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল এক জনমত গড়ে উঠতে থাকে। এই রকম নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে ইতালীতে দেখা দিল তীব্র এক অর্থসংকট। চারদিকে অভাব-অনটন, বেকারত্ব ও ধর্মঘট যেন লেগেই ছিল। উত্তরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। অনেক জায়গায় শ্রমিকরা কারখানার কর্তৃত্ব মালিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কৃষকরাও সুযোগ বুঝে জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। দেশের সরকার এই অবস্থার মোকাবিলা করতে পারলেন না। দেশে তখন প্রয়োজন এক দৃঢ় নেতৃত্বের। এই সুযোগে জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করবার এবং শাসন ব্যবস্থায় সংহতি আনবার জন্যে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন বেনিতো মুসোলিনী। তিনি যুদ্ধ-ফেরত দুর্দশাগ্রস্ত সৈনিকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন। এদের বলা হ'ত ফ্যাসিস্ট।

ফ্যাসিবাদের মূল কথা

গণতান্ত্রিক আদর্শে ব্যক্তির স্থান রাষ্ট্রের ওপরে। অর্থাৎ ব্যক্তির জন্যেই রাষ্ট্র—এই মতকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু ফ্যাসিবাদের মূল কথা ঠিক এর বিপরীত। সেখানে ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রই বড়। সুতরাং রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তিকে সব কিছু এমন কি নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই নীতি অনুসারে মুসোলিনী ইতালীতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তাতে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছুই রইল না। সরকারের কাজের বিরূপ সমালোচনা পর্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হ'ল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হ'ল। এইভাবে মুসোলিনী ইতালীতে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ইতালীকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

জার্মানীতে নাৎসীবাদের উত্থান

ভার্সাই সন্ধির পর জার্মানীতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। সেই সরকার ভার্সাই সন্ধির সমস্ত অপমানজনক শর্ত মেনে

নিয়েই শাসন আরম্ভ করেছিল। কিন্তু দেশের কোন শ্রেণীর লোকই এই সন্ধির শর্ত মেনে নিতে রাজী হয়নি। জার্মানীর দেশপ্রেমিক সৈন্যরাও জার্মানীর অপমান ও জার্মান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে বিরাট ঋণের বোঝা জার্মানীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা পরিশোধ করতে গিয়ে দেশের মধ্যে এক নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে এডলফ্ হিটলার নামে জনৈক প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী "ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট" নামে একটি দল গঠন করে জার্মানীর শাসনক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই দলটিই সংক্ষেপে নাৎসী নামে পরিচিত। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পূর্ণভাবে দূর করবার পরিকল্পনা ঘোষণা করে হিটলারের নাৎসীদল ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হ'ল।

নাৎসী দলের কর্মসূচীর প্রধান কথাই ছিল সমগ্র জার্মান ভাষা-ভাষীদের নিয়ে একটি বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন করা। ১৯৩২ সালে নাৎসীদল নির্বাচনে জয়ী হয় এবং হিটলার জার্মানীর চান্সেলর নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরে জার্মান প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলে তিনি ঐ পদে অভিষিক্ত হন। কালক্রমে তিনি জার্মানীর একক অধিনায়ক হয়ে ওঠেন।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল—(১) ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করা এবং (২) ইওরোপের সমগ্র জার্মান জাতিকে একত্রিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মন দিলেন। তিনি জার্মানী, জাপান ও ইতালীর মধ্যে একটি মৈত্রী সংঘ গঠন করলেন। তারপর তিনি জার্মানীর বাইরে সমস্ত জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলকে জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত করতে অগ্রসর হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একে একে অস্ট্রিয়া, সুদেতানল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নিলেন। হিটলার ডানজিগ শহরও দখল করলেন এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। তাঁর এই আগ্রাসী নীতিতে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

জাতি সংঘ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতি সংঘ গঠিত হয়েছিল এবং ভার্সাই সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশ এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। জাতিসংঘের ভূমিকায়

এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক সমবায় বৃদ্ধি করে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতি সংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিরোধের নিষ্পত্তি করে দিয়ে জাতি সংঘ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের সমাধানে জাতি সংঘ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১), ইতালীয় আবিসিনিয়া আক্রমণ (১৯৩৫) ও আলবানিয়া অধিকার (১৯৩৯), স্পেনের গৃহযুদ্ধ, হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং গ্রীস ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ—এই সব ক্ষেত্রে জাতি সংঘ কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

কারণ

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেসব সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। বস্তুত ভার্সাইয়ের সন্ধি দ্বারা জার্মানীর ক্ষমতাকে যেভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন জাতির পক্ষেই তা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই প্রথম থেকেই জার্মান জাতির মনে এই সন্ধি ভঙ্গ করবার ইচ্ছা জেগেছিল।

নাৎসীদলের নায়ক হিটলার চেয়েছিলেন জার্মানীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে জার্মানীর প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মান জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণে হিটলার কৃতসঙ্কল্প হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে মনস্থ করলেন।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল জার্মানীর হাতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা আর সেই সঙ্গে জার্মান জাতি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে একটা বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র গড়ে তোলা। তাই তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি জোর করে ছিনিয়ে নেবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

জার্মানীকে সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রাখবার উদ্দেশ্যে ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হিটলার সেই সন্ধিচুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রকাশ্যভাবে নিজের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। হিটলারের নির্দেশে জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক আইনও জারি হ'ল।

জার্মানী সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তখন মতানৈক্য চলছিল। হিটলার বুঝেছিলেন যে, এই মতানৈক্য হেতু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে না। এই কারণেই তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতে সাহসী হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রাথমিক সাফল্য হিটলারকে ভবিষ্যতে বৃহত্তর ঝুঁকি নিতে প্রেরণা দিয়েছিল।

১৯৩১ সালে স্পেনে যে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে রাশিয়ার অনুকরণে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল। তখন

ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে সেখানে এক জাতীয়তাবাদী বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। এই গৃহযুদ্ধে পৃথিবীর কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে এবং অপরদিকে হিটলার ও মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোকে প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো এই গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেন। এইভাবে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মানী হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। তাদের এই নির্লিপ্ততা থেকেই হিটলার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দুর্বলতার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতার সুযোগে হিটলার অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্য দুটি গ্রাস করে নিলেন। অনেকের মতে ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল করে গড়ার ফলে জার্মানীর পক্ষে চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে গ্রাস করা সহজ হয়েছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় ছিল জাতি সংঘের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাদের ঐক্য ও সমর্থনের ওপরেই ইওরোপের স্থিতাবস্থা নির্ভরশীল ছিল। যদি এই দুই শক্তি জাতি সংঘকে জোরদার করত তাহলে জাতি সংঘের পক্ষে আক্রমণকারী দেশগুলিকে শাসন করা হয়ত সম্ভব হ'ত। কিন্তু ১৯১৯ সালের পর থেকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির মতভেদ ও ভিন্নমুখী বৈদেশিক নীতি জাতি সংঘকে দুর্বল করে দেয়।

জার্মানী যখন আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে একের পর এক রাজ্য গ্রাস করে চলেছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখনও পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। তাই তারা চাইছিল যুদ্ধকে বিলম্বিত করতে। তাছাড়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন রুশ কমিউনিজমের ভয়ে জার্মানীর সঙ্গে তোষণ নীতি অবলম্বন করে চলছিলেন। তাই ইংলণ্ড জার্মানীর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করে চোখ বুজে বসেছিল। ইংলণ্ডের এই অদূরদর্শী নীতির জন্যেই জার্মানীকে তখন সংযত করা সম্ভব হয়নি।

হিটলার ছিলেন ঘোরতররূপে কমিউনিস্ট বিরোধী। রাশিয়ায় যে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে হিটলার ১৯৩৬ সালে জাপানের সঙ্গে এক কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। পরের বছর ইতালী তাঁর সঙ্গে যোগদান করায় রোম-বার্লিন-টোকিও চক্র গড়ে উঠল। এইভাবে ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নতুন শক্তিজোট প্রতিষ্ঠিত হল তার ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিতে ক্রমেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ। ভার্সাই সন্ধি জার্মানী-পোল্যাণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি ভৌগোলিক সমস্যার

সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া হিটলার পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতারক্ষায় মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই ১৯৩৯ সালে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার উদ্যোগ করেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন জার্মানীকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে তারা চুপ করে বসে থাকবে না। হিটলার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই হুঁশিয়ারী গ্রাহ্য করলেন না। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সেনা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে, ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

আমরা দেখেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল আর সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। রুশ বিপ্লব থেকে যে সাম্যবাদী ভাবধারার উদ্ভব হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রুশ দেশের অনুকরণে সাম্যবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সেই সব দেশ স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার এই প্রভাব বৃদ্ধির ফলে রাশিয়া আজ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। শুধু রাশিয়া নয়, আমেরিকাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া ও আমেরিকার অভ্যুত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে ছিল ইওরোপের কয়েকটি দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ঐসব উপনিবেশের মানুষের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগতে শুরু করে। যুদ্ধ শেষে ইওরোপের অনেক রাষ্ট্রই বুঝতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই যুদ্ধশেষে তাদের অনেকেই তাদের উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করে। বিদেশী শাসকদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করল না তাদের হাত থেকে সেই সব উপনিবেশের মানুষ আন্দোলন চালিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিল। সুতরাং বলতে পারি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল।

সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন তাদের স্থান অধিকার করে রাশিয়া এবং আমেরিকা। এদের মধ্যে আমেরিকা ধনতান্ত্রিক দেশ এবং রাশিয়া সাম্যবাদী। রাশিয়ার সাম্যবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির স্বার্থ বিপন্ন হবে। তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্রগুলি জোট বেঁধেছে। এইভাবে পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টবিরোধী—এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং এইটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ফল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নত দেশগুলি বুঝতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে না পারলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করা সম্ভব নয়। তাই তারা অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করে যাচ্ছে। বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আনয়নের জন্যে উন্নত দেশগুলির এই যে প্রচেষ্টা একেও আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে বর্ণনা করতে পারি।

আণবিক শক্তির ব্যবহার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। এর আগে যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের ঘাঁটিগুলিই ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম আণবিক বোমা ব্যবহৃত হল জাপানে নাগাসাকি ও হিরোসিমার ওপরে। এর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শহর দুটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সব শক্তিশালী দেশই এখন আণবিক শক্তির অধিকারী। সবাই জানে এই মারণাস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সবাই এখনও সংযত হয়ে আছে এবং যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। সুতরাং এই আণবিক শক্তি একদিকে যেমন বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখেছে অন্যদিকে তেমনি এই শক্তি মানুষের অশেষ কল্যাণ-সাধন করে চলেছে।

কারিগরী বিদ্যার উন্নতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীতে কারিগরী বিপ্লবের সূচনা করেছে। সব দেশই চায় আত্মনির্ভরশীলতা। কিন্তু সব জিনিস তো আর সব দেশে পাওয়া যায় না। তাই কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সেই সব জিনিস এখন তৈরী হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম পশম, কৃত্রিম সুতো, নাইলন, প্লাস্টিক প্রভৃতির উদ্ভাবন কারিগরী শিল্পে যুগান্তর এনে দিয়েছে এবং এ সবই নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান।

আমরা দেখেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কতকগুলি সাংগঠনিক

ত্রুটীর জন্য ইচ্ছে থাকলেও জাতি সংঘ তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেনি। আর তা পারেনি বলেই মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে একটি আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হ'ল। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সময় জাতি সংঘের ব্যর্থতার কারণগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করা হয়েছিল এবং সেই সব সাংগঠনিক ত্রুটীগুলি যথাসম্ভব দূর করা হয়েছে যাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটা মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে। রাজনীতি ছাড়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে পৃথক্ একটি কমিটি আছে। কারণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মনে করে যে অনুরূপ যোগাযোগ বিভিন্ন দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস এবং সৌহার্দ্যসূচক মনোভাব সৃষ্টির সহায়ক হবে। এই ধরনের একটি আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল।

ষোড়শ অধ্যায়

ভারত (১৯১৯—১৯৪৭)

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

ভূমিকা

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতবর্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে ইংরাজদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তাই স্বভাবতই ভারত আশা করেছিল যে যুদ্ধে জয়ী হলে ইংরাজরা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই কিছুটা পূরণ করবে। যুদ্ধ চলাকালীন ভারত-সচিব ঘোষণা করেছিলেন যে, ধাপে ধাপে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করলেন। কিন্তু এই শাসন সংস্কার ভারতীয়দের স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারল না। আশাহত ভারতীয়রা তখন বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ইংরাজরা আন্দোলন দমনের জন্য রাউলাট আইন নামে এক দমনমূলক আইন পাশ করলেন। এই আইনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার জাতীয় সংগ্রামকে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা হ'ল।

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশময় প্রতিবাদের ঝড় উঠল। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ মাঠে রাউলাট আইনের প্রতিবাদে যে জনসভা চলছিল তার ওপর বেপরোয়াভাবে গুলি চালাবার নির্দেশ দিলেন ইংরাজ সেনাপতি ডায়ার। কয়েক শ' নিরীহ নরনারী নিহত হ'ল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশময় বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল। এই হত্যাকাণ্ডেরই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

এই সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এক নিদারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমান জগতের খলিফা অর্থাৎ প্রধান ধর্মগুরু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজ ও তার মিত্রেরা তুরস্কের সুলতানের প্রতি অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহার করায় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী ও তাঁর ভ্রাতা মৌলানা সৌকত আলীর নেতৃত্বে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন শুরু হ'ল। এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন

এইরকম পরিস্থিতিতে দেশে এক মহান্ নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি এসে ভারতের জাতীয় আন্দো-

লনকে সম্পূর্ণ এক নতুন পথে পরিচালিত করলেন। গান্ধীজী বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরে একটি মামলা উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের হাতে ভারতীয়দের নানারকম লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হত। গান্ধীজী তার প্রতিকারের জন্য সেখানে আন্দোলন শুরু করলেন। গান্ধীজী এর নাম দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কোনরকম অস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, মনে কোন হিংসা বা বিদ্বেষ না রেখে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, যা সত্য, যা ন্যায়, তার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল। সেখান থেকে ভারতে ফিরে গান্ধীজী গোখেলের পরামর্শে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে প্রথমে নিজের দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তারপর তিনি জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ স্থির করে সেই আদর্শে উপনীত হবার পন্থা নির্ণয় করলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন যে, কংগ্রেসকে সত্যকার গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে না পারলে কংগ্রেসের আদর্শ জয়যুক্ত হবে না। এই কারণে তিনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার জন্যে ধনী-দরিদ্র, জমিদার-কৃষক, শিক্ষক-ছাত্র, ডাক্তার-উকিল এবং শ্রমিক প্রভৃতি সর্বস্তরের দেশ-বাসীকে আহ্বান জানালেন। দলে দলে মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক গৌরবদৃপ্ত যুগের সূচনা হ'ল। এই যুগকে অনেক ঐতিহাসিক গান্ধীযুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গান্ধীজী যখন এক সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নিয়ে জাতির সম্মুখে উপস্থিত হলেন দেশের আপামর জনসাধারণ তখন অকপটে তাঁকে নেতৃপদে বরণ করে নিল। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দেলন শুরু করলেন। এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ হ'ল বিলাতী দ্রব্য বর্জন, আইন-সভা, সরকারী চাকুরী, আদালত, সরকারী স্কুল-কলেজ ইত্যাদি পরিত্যাগ, সরকারী খেতাব বর্জন এবং নীতিবিরুদ্ধ আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধের দ্বারা সরকারকে দুর্বল ও অচল করে দেওয়া।

গান্ধীজীর আহ্বানে জাতীয় উদ্যম সমতালে সংগঠন ও আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে লাগল। দেশী কাপড়ের অভাব মেটাবার জন্যে ঘরে ঘরে চরকা চলল, তাঁত বসল। শিক্ষার জন্য জাতীয় স্কুল-কলেজ স্থাপিত হ'ল। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের কর্মসূচী জাতিকে ক্রমশ আত্মসচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলল। সরকার দেশ জুড়ে ধরপাকড় চালাতে লাগলেন। সত্যাগ্রহীতে জেল ভরে গেল। এমন সময়ে একদল ক্ষিপ্ত জনতা উত্তর

প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচেরা থানা আক্রমণ করে বাইশজন পুলিশকে হত্যা করল। সত্যাগ্রহে হিংসা বা হত্যার কোন স্থান নেই। দেশ সত্যাগ্রহের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি দেখে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

কৃষক-শ্রমিকের অংশ গ্রহণ

আমাদের জাতীয় সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা কংগ্রেস নেতারা বুঝেছিলেন। তাই গান্ধীজী প্রথম থেকেই কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি নজর দেন। তিনি ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। আমেদাবাদের মিল-মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং গুজরাটে কৃষক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলে এই যুগের কৃষক আন্দোলন বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালে সারা ভারত কিষাণসভা গঠিত হবার ফলে কৃষক সমাজের মধ্যে এক নতুন জাগরণ দেখা দেয়। তারা তখন থেকে জমিদারী প্রথা ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে।

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতে শিল্পোন্নয়ন বিশেষ কিছুই হয়নি। তাছাড়া দারিদ্র্য, বেকারী ও আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলন তেমন সম্প্রসারিত হতে পারেনি। শ্রমিকদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব হেতু আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা, রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা প্রভৃতির যুক্ত প্রভাবে ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মনে করত কংগ্রেসের নীতি কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধী। তাই আইন-অমান্য আন্দোলনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেয়নি। ১৯৩১ সালে তারা নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং সূতা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। পরে এই পার্টি বুঝতে পারে যে, কংগ্রেস হ'ল একটি গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে একজোটে সংগ্রাম না করলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তাই কমিউনিস্টরা তখন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে

শ্রমিকদের উন্নতিবিধানে একটি যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করল। ফলে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ ঘটে।

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করে। পরের বছর ২৬শে জানুয়ারী দেশময় সর্বত্র জাতীয় পতাকা সাক্ষী করে স্বাধীনতা অর্জনের শপথ গৃহীত হ'ল। এই শপথ গ্রহণ দেশবাসীর অন্তরে এক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করে। দেশব্যাপী এই উৎসাহের সঞ্চার লক্ষ্য করে গান্ধীজী তখন দেশবাসীকে আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। গান্ধীজী অতঃপর বড়লাটকে কয়েকটি জাতীয় দাবি সমন্বিত এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। কিন্তু বড়লাট সেই সকল দাবি প্রত্যাখ্যান করলে আইন-অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার লবণের ওপর কর ধার্য করেছিলেন। দরিদ্র ভারতবাসীর তখন শুধু নুন ভাতই ছিল প্রধান খাদ্য। সেই লবণের ওপর কর স্থাপনের ফলে ভারতের দরিদ্র জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সবচেয়ে বেশি। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সহকর্মী নিয়ে পদযাত্রা শুরু করলেন। ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করার পর তিনি গুজরাটের সমুদ্র-কূলে ডাণ্ডি নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। এই ২৪ দিন সময়ের মধ্যে পথের বহু গ্রামে তিনি জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। পরের দিন সকালে সমুদ্রকূলে একমুঠো লবণ সংগ্রহ করে গান্ধীজী সরকারের আবগারি আইন ভঙ্গ করলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেই দিন থেকেই আইন অমান্যের কাজ শুরু হয়ে গেল। পুলিশের লাঠি ও গুলিকে উপেক্ষা করে সত্যাগ্রহীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য গান্ধীজী অতঃপর ধরসানা নামক স্থানে অবস্থিত একটি সরকারী নুনের গোলা দখল করে নেবার জন্যে সত্যাগ্রহীদের নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীকে আটক করা হ'ল।

গান্ধীজীর পর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন বৃদ্ধ নেতা আব্বাস তায়েবজী। তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করল। বাংলার প্রসিদ্ধ অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। মহিষবাথান ও কাঁথি ভারতের মানচিত্রে লবণ সত্যাগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণাঙ্গন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

কর বন্ধ আন্দোলন

কর বন্ধ আন্দোলন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আর একটি অস্ত্র। কর বন্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে গুজরাট, কর্ণাটক, বাংলার কাঁথি ও বিক্রমপুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। গুজরাটের অধিবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে কর দান বন্ধ করে। পুলিশের নির্মম অত্যাচার তাদের গৃহহারা করে। তারা তখন নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে বরোদা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সার্থক করবার জন্যে অশেষ দুঃখ বরণ করে নেয়। বাংলার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরাও এই কর বন্ধ আন্দোলনে অপূর্ব ত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিল।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন

অহিংস সংগ্রামের আর একটি অস্ত্র ছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন। এই আন্দোলনের ফলে বিলেতী কাপড় বিক্রী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বোম্বাই ও আমেদাবাদের ভারতীয় মিল-মালিকরা বিদেশী বস্ত্র বয়কটের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতে থাকেন। তাঁরা বিদেশী সূতা বর্জন করে স্বদেশজাত সূতার দ্বারাই বস্ত্র বয়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। এরই ফলে ভারতে বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আন্দোলন

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফুর খানের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ এক বিশিষ্টরূপ ধারণ করে। সেখানে সভাসমিতি সম্পর্কে নিষেধমূলক আইন ভঙ্গ করাই ছিল প্রধান কর্মসূচী। পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা ও সভা করার চেষ্টা দৃঢ়ভাবে চলতে থাকে। অহিংস সত্যাগ্রহীদের দমন করার জন্যে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এত কাণ্ড করেও আন্দোলন দমন করা গেল না। স্থানীয় সত্যাগ্রহী দল অহিংস নীতিতে অটল রইল। এদের নাম ছিল "খোদাই খিদ্‌মৎগার" বা ঈশ্বরের ভৃত্য।

পদাঘাত ও করমর্দন নীতি

আইন অমান্য আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে তখন একদিকে কংগ্রেস নেতাদের বুটের গুঁতা মেরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অন্যদিকে গোল টেবিল বৈঠকের নামে বৃটিশের মনোনীত খয়ের খাঁ ভারতীয় নেতৃবর্গকে লণ্ডনে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস বর্জিত গোল টেবিল বৈঠক যে মূল্যহীন একথা বুঝতে বৃটিশ প্রভুদের

বিলম্ব হ'ল না। কংগ্রেসকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী করাবার জন্য ইংরাজ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসায় আগ্রহী হল। ফলে ১৯৩১ সালে বড়লাট লর্ড আরউইন এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে সরকার বন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিল এবং কংগ্রেসও আন্দোলন বন্ধ করে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে রাজী হ'ল। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা করলেন। কিন্তু গান্ধীজীর স্বাধীনতার দাবি গোলটেবিল বৈঠকে সমর্থিত হ'ল না। সুতরাং একরকম শূন্য হাতেই গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠক থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন।

সরকারের দমননীতি

মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে দেখলেন যে, ভারত সরকার ব্যাপক দমন নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করে সরকার কংগ্রেস কর্মীদের নানাভাবে নির্যাতিত করছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খোদাই-খিদ্‌মৎগার বাহিনীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে এবং আব্দুল গফুর খাঁ ও তাঁর ভাই ডাঃ খাঁ সাহেব কারারুদ্ধ হয়েছেন। এইসব দেখে গান্ধীজী ১৯৩২ সালের গোড়াতে আবার নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিলেন। গান্ধীজীর আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে বহু কংগ্রেস নেতা ও হাজার হাজার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী কারারুদ্ধ হলেন। সরকার দমননীতির সাহায্যে জাতীয় আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেন।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

তিনটি গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনাকে অবলম্বন করে যে নতুন শাসন সংস্কারের খসড়া তৈরী করা হয়েছিল তাকে ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হ'ল। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১১টি প্রদেশে নতুন আইন অনুসারে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য প্রমাণ করল যে, জনগণের চিত্তে কংগ্রেসের আসন এখনও অটল।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইংলণ্ড এই মহাসমরে লিপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষও সমররত দেশ বলে ঘোষিত হল। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের কোন মতামত নেওয়া হ'ল না। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ইংরাজদের এই যুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল যদি ব্রিটেন

ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ব্রিটেন তা দিতে অসম্মত হওয়ায় কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

বিশ্বযুদ্ধের সমরাঙ্গন এতদিন ছিল ইওরোপ। কিন্তু ক্রমে তা ধীরে ধীরে প্রাচ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে অনুরোধ করে 'হরিজন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সেই মর্মে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধী ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। যে প্রস্তাবে এই সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প গ্রথিত ছিল তাই "আগস্ট প্রস্তাব" বা "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হল। পরের দিন সকালে সরকার কংগ্রেস নেতৃবর্গকে কারা-রুদ্ধ করলেন। ফলে ভারতে সর্বত্র এক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দেখা দিল। গান্ধীজীর "করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে" আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ভারতবাসী নেতৃত্বহীন অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের সৃষ্টি করল। সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, টেলিগ্রাফ লাইন, থানা প্রভৃতি ধ্বংস করে ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে স্বতন্ত্র জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়েছিল। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও কাঁথির মত স্বতন্ত্র সরকার চালু হয়। নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ আয়োজন নেই, নেই কোন মন্ত্রবল—একটা অসহায় জাতি স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রচেষ্টার অন্য পথ না দেখে যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত বিদ্রোহে ফেটে পড়ল।

আজাদ হিন্দ্

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁর মনটা বরাবরই ছিল বিপ্লবী। তাই বরাবরই তিনি কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দলের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি ইংরাজদের ওপর চরম আঘাত হানবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গৃহবন্দী অবস্থায় তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গেলেন। পথে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করে শেষে তিনি

জার্মানীতে এসে পৌঁছলেন। জার্মান সরকারের সহযোগিতায় তিনি বার্লিন থেকে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ভারতবাসীকে সজাগ করে তুলতে লাগলেন।

টোকিওতে তখন আর এক বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর নেতৃত্বে কুয়ালালামপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হয়। তারপর জাপানী আক্রমণে ইংরাজদের ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন হলে সেখানকার ভারতীয় সৈন্যেরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করে। অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় রাসবিহারী তখন চাইছিলেন সুভাষচন্দ্রের মত একজন যোগ্য নেতার হাতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্বভার ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে। তাই তিনি টোকিওতে সুভাষচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পূর্ণ কর্তৃত্ব তুলে দিলেন তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে। এখন থেকেই সুভাষচন্দ্র হলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রিয় নেতাজী। এর পর সুভাষচন্দ্রের সুযোগ্য নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বিরাট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল।

পূর্ব ব্যবস্থা মত নেতাজী প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার। তাঁর সেই সরকারকে মেনে নিয়েছেন ইংরাজ-বিরোধী নয়টি দেশ। জাপানী বাহিনীর হাত থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন নেতাজী। আন্দামানের সেলুলার জেলের শীর্ষে তিনিই প্রথম উড়িয়েছেন অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা। ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের ভেতরে কোহিমা ও ইম্ফল পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাভাবের জন্যই শেষ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করে ইংরাজদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে না পারলেও নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কীর্তি দেশবাসীর মনে যে অদম্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আত্মসমর্পণকারী আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদের বিচার

জাপানের পরাজয় আসন্ন দেখে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়ে জাপান অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই নির্দেশ অনুসারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর আত্মসমর্পণকারী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সামরিক বিচার

শুরু হয় দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লায়। ইংরাজ সরকার একটি সামরিক আদালত বসিয়ে এই বাহিনীর তিন প্রধান নেতাকে কঠোর সাজা দেবার আয়োজন করলেন। এই তিনজন নেতা ছিলেন—কর্ণেল পি. কে. সায়গল, মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খাঁ এবং কর্ণেল জি. এস. ধীলন। দিল্লীর লালকেল্লায় সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃবৃন্দের বিচারের আয়োজন দেশব্যাপী এক গণবিক্ষোভের সৃষ্টি করল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বহুদিন পরে ব্যবহারজীবীর পোশাক পরে এই মামলায় অংশ গ্রহণ করায় বিচার সভার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেল। সামরিক আদালতে বিচার পরিচালনাকালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ ভারত-বাসী প্রথম জানতে পারে। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালী ও জীবনপণ সংগ্রামের কথা জনগণের চিত্তে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। বিচারে অভিযুক্ত তিন জন নেতার কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল বটে, কিন্তু প্রবল জন-মতের চাপে সরকার প্রত্যেককেই মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

নৌ বিদ্রোহ

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারকালে দেশব্যাপী জনমানসে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাতে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন আর বেশিদিন চলবে না। এই ঐতিহাসিক বিচারকালে একথা কারুরই অজানা রইল না যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও দেশের স্বাধীনতা চায়। সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এই স্পৃহা যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহের মধ্যে। একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এরকম ব্যাপক ও সার্থক বিদ্রোহের মূলে ছিল তাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত স্বাধীনতা স্পৃহা। তাই কংগ্রেস নেতাদের প্রভাবের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহের অবসান ঘটেছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতিপর্ব

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক নতুন প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবর্গের বিবেচনার জন্য পেশ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের নিয়ে সিমলায় আলোচনা বৈঠক বসল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্না ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসল-মানরা এক স্বতন্ত্র জাতি এবং তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। সিমলা

বৈঠকে জিন্না সেই জিদ ধরে বসে রইলেন। তাই বৈঠকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারল না।

মন্ত্রিমিশন

১৯৪৬ সালে ইংলণ্ড থেকে ভারত-সচিব সহ দুজন মন্ত্রী আপস আলোচনার জন্য ভারতবর্ষে এলেন। কংগ্রেস দাবি করল, আগে সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এবং তারপর ভারতীয়রাই দেশের ভবিষ্যৎ স্থির করবে। কিন্তু মুসলিম লীগ এই দাবির বিরোধিতা করার ফলে আপস আলোচনা বানচাল হয়ে গেল।

অবশেষে মন্ত্রিমিশন এক মাঝামাঝি পরিকল্পনা খাড়া করলেন। এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগ কারুরই মনঃপূত হ'ল না। অগত্যা মন্ত্রিমিশন এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে ভারত সরকারের কর্তব্য নির্দেশ করলেন।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

মন্ত্রিমিশনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে, প্রথমে বড়লাট একটি গণপরিষদ আহ্বান করবেন। এই পরিষদ ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সাময়িকভাবে শাসনকার্য চালাবার জন্য বড়লাট ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করল, কিন্তু মুসলিম লীগ করল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জনকয়েক কংগ্রেস সভ্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করলেন। কিছুদিন পর মুসলীম লীগও তাতে যোগ দিল।

ভারত বিভাগ

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—এই দুই আমূল ভিন্ন মতাবলম্বী দলের পক্ষে একযোগে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। পদে পদে মতান্তর ও মনান্তর ঘটতে লাগল। এই বিবাদের বিষ সরকারী গণ্ডী ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং অবশেষে তা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হল। বাংলা, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমান নৃশংসভাবে পরস্পরের হত্যায় মেতে উঠল। নিরুপায় হয়ে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগে সম্মত হ'ল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরাজ সরকার আইন করে সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করলেন। ভারতবর্ষ দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে খণ্ডিত

হ'ল। বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, পর্ব বাংলা ও আসামের শ্রীহট্ট জেলার কিয়দংশ নিয়ে হ'ল পাকিস্তান, অবশিষ্ট অংশ হল ভারত। দেশীয় রাজ্যগুলিকে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন একটির সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার দেওয়া হ'ল। জনসাধারণের নির্বাচিত পরিষদ ভারতের সংবিধান রচনা করল এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত-বর্ষ প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হ'ল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে আছে বহু কর্মীর একনিষ্ঠ সাধনা ও বহু শহিদের আত্মবলিদান। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম পরিচালনা করবার জন্যে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত জননায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। এই নেতৃদ্বয় ও অগণিত আত্মত্যাগী দেশকর্মীরা স্বপ্ন দেখেছিলেন এক নবীন ভারতবর্ষের। সে ভারতবর্ষ বর্ণভেদ প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্কীর্ণতা এবং সর্ববিধ ধর্মীয় ও জাতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবে। সে ভারতবর্ষে বিপুল ধনবৈষম্য থাকবে না, সকলের থাকবে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনের আনন্দ উপভোগ করবার সমান অধিকার। মহাপুরুষ ও দেশপ্রেমিকদের এই স্বপ্ন সার্থক করার দায়িত্ব আজ দেশের কোটি কোটি নরনারীর ওপর অর্পিত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা সেই নতুন ভারতের সন্ধানী, আমরা মহা-ভারতের তীর্থযাত্রী।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

চীনদেশের বিপ্লব-কাহিনী (১৯১১—৪৯)

ভূমিকা

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যে বিপ্লব ঘটেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল দুটি— প্রথমতঃ মাঞ্চুবংশের শাসন উচ্ছেদ করে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান এবং দ্বিতীয়টি হল বিদেশীদের সকল রকম সুযোগ-সুবিধা নাকচ করে চীনের সার্বভৌমত্ব পুণরুদ্ধার করা। প্রথম উদ্দেশ্যটি সাময়িকভাবে সফল হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কোন কিছু ব্যবস্থা নেবার পূর্বেই চীনের প্রথম প্রজাতন্ত্রের ভিত ধসে পড়ে।

য়ুয়ান শি-কাই ও সুন ইয়াৎ-সেনের মধ্যে বিরোধ

য়ুয়ান শি-কাই ছিলেন অত্যধিক উচ্চাভিলাষী এবং ক্ষমতালিপ্সু। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার সময় তিনি জাতীয়সভার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চাপ দেন। কিন্তু জাতীয়সভায় সুনের প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিন্‌টাং দলের সংখ্যা বেশী ছিল। তাঁরা য়ুয়ানের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। এইভাবে দুই পক্ষের মধ্য বিবাদের সূত্রপাত হয়। য়ুয়ান যখন জাতীয়সভার বিনা অনুমতিতে বিদেশীদের কাছ থেকে মোটা ঋণ গ্রহণ করেন তখন এই বিবাদ চরমে উঠে। সুন য়ুয়ানের পদত্যাগের দাবী জানালেন এবং একে কার্যে পরিণত করবার জন্য একটি সামরিক অভিযানেরও প্রস্তুতি নেন। কিন্তু য়ুয়ান এই প্রচেষ্টাকে সহজেই গুঁড়িয়ে দিলেন।

এর পরে য়ুয়ান জাতীয়সভা ভেঙ্গে দিয়ে বিনাবাধায় ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে থাকেন। এতেও তাঁর মনের আশা মিটল না। তিনি উত্তর চীনের সমর নায়কদের একত্র করে চীনের একচ্ছত্র সম্রাট হবার বাসনা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু বাধা দিলেন দক্ষিণ চীনের সমর-নায়কেরা। তাঁরা ছিলেন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। এঁদের বাধার কাছে য়য়ানকে নতি স্বীকার করতে হল। এইভাবে দক্ষিণ চীনের সেনাপতিদের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর অল্পকাল পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ানের মৃত্যু হয়।

জঙ্গিবাজদের কবলে চীন

য়ুয়ানের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি লাই য়ুয়ান-লুং হলেন নতুন রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রজাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি পুরানো ভেঙ্গে দেওয়া জাতীয়সভা পুনরাহ্বান করলেন। কিন্তু মুস্কিল বাধালেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী তুয়ান (সেনাপতি) চি জুই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন এত দিন ছিল সম্পূর্ন নিরপেক্ষ। প্রধানমন্ত্রী চাইলেন যুদ্ধে যোগদান করতে। কিন্তু জাতীয়সভা বাধা দিলে আবার তা ভেঙ্গে দেওয়া হল। এটা রাষ্ট্রপতি লাইর মনঃপূত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য তিনি চাঙ্ সূন নামে অপর একজন প্রভাবশালী সেনাপতির সাহায্য চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী বিতাড়িত হলেন। কিন্তু চাঙ্ সূন বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেই সকল ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করেন। তখন থেকে দেশের সর্ব-শক্তিমান সমর নায়কদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বেধে যায়। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হল রাজধানী অধিকার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্বই প্রায় লোপ পেয়ে যাবার উপক্রম হল। এর সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমর-নায়কেরা স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন চাঙ্ সু-লিন। তিনি মাঞ্চুরিয়ায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।

এই সময় চীনের মানুষ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দিনে রাত্রে সব সময়েই সৈন্যদের ছোট ছোট দল লুঠতরাজ, ডাকাতি, খুনখারাপি করে বেড়াত। সাধারণ চাষী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী—কেউই এদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। এই রকম চরম অরাজকতা প্রায় দশ বছর (১৯১৭-২৬) ধরে চলেছিল।

সুন্-এর তিন নীতি

১৯১৭ সাল থেকে সুন ইয়াৎ-সেন দক্ষিণ চীনের বন্দর-শহর ক্যান্টনে বাস করছিলেন। তাঁর সমর্থক বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, অনুচরবৃন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন সুন্-এর প্রচেষ্টায় আবার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। সদস্যেরা সুনকেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সেনাপতির পদে নিবাচিত করেন। সুন্ দাবী করতেন যে, তাঁর সরকারই হল চীনের বৈধ সরকার।

সুন্ তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেখান থেকে যা কিছু সাহায্য পাওয়া যেত তাই গ্রহণ করতেন। তিনি ক্রমে সাম্যবাদী রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তাদের সাহায্যে তিনি তাঁর জাতীয়পন্থী সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। এইভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে সুন্ দক্ষিণ চীনের

জঙ্গিবাজদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন এবং কিছু কিছু সাফল্যও অর্জন করলেন।

৪ঠা মে আন্দোলন

বিজিং সরকারের মত সুন্-এর জাতীয় সরকারও প্রায় একই সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল জামান্-অধিকৃত অঞ্চলগুলি তাদের পরিচালিত রেলপথ, শিল্পসম্ভার চীনের জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্যারিস্ সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিগণ এই একই দাবী জানালেন। তা'ছাড়া তাঁরা আরও চাইলেন যে, চীনে বিদেশীরা যে সকল অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তারও অবসান ঘটাতে হবে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে চীনের কোন দাবীই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। ১৯১৯ সালের ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী জার্মান অধিকৃত অঞ্চলগুলি জাপানকে দেওয়া হয়। এই খবর চীনে পৌছলে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ছাত্ররা ৪ঠা মে তারিখে বিক্ষোভ মিছিল বের করে দেশব্যাপী এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তোলে। এটাই ছিল সমগ্র চীনের প্রথম জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন। চীনের জনমানসে তখন থেকে জাতীয়তাবোধ সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এর ফল পাওয়া গিয়েছিল প্রায় তিন বছর পরে ১৯২২ সালে। তখন আমেরিকার রাজধানী ওয়াসিংটন শহরে বৃহৎ শক্তিদের একটি বৈঠক বসে। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, জাপান জার্মান-অধিকৃত সান্টুং এলাকা চীনকে ফিরিয়ে দেবে; বিদেশীরা চীনের কাছ থেকে আর নতুন কোন সুযোগ-সুবিধা দাবী করতে না পারে এবং যাতে সেখানে একটি স্থায়ী সরকার গড়ে উঠতে পারে তার জন্য উপযুক্ত সুযোগের সৃষ্টি করে দেবে। চীনে বিদেশী-কর্তৃত্বের অবসান সম্বন্ধে কোনরকম উচ্চবাচ্য হল না।

চীনে যে এক নতুন নবজাগরণের যুগ এসেছে সুন্ তা পুরোপুরি ভাবেই বুঝতে পারলেন। এই নতুন পরিস্থিতিতে চীনের জনগণের কি লক্ষ্য হবে সে সম্বন্ধে সুন্ তিনটি নীতি নির্দিষ্ট করে দেন। এর প্রথমটি হল জাতীয়তা-বাদ, অর্থাৎ চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে বিদেশীদের সকল রকম সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়টি গণতন্ত্রবাদ, অর্থাৎ চীনে কোন রাজা থাকবে না, রাজ্যের শাসনভার থাকবে গণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। তৃতীয়টি হল জীবনোপায় অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সকলকে সমানভাবে জীবনধারণের সুযোগ দিতে হবে। এই শেষ নীতিটি থেকে বোঝা যায় যে সুন্ সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন আর এই কারণেই তিনি কমিউনিস্ট দলের সাহায্য লাভ

করতে পেরেছিলেন। চীনে কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২১ সালে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মাও জে-তুঙ্ ছিলেন একজন।

এদিকে সুন্ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিমা শক্তি-বর্গ কিছুতেই চীন ছেড়ে যাবে না। তাই তিনি রাশিয়ার সাহায্য লাভের জন্য কথাবার্তা চালাতে থাকেন। এর একটা বিশেষ কারণও ছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর সাম্যবাদী রুশরা তাদের সকলরকম দাবা-

মাও জে-তুঙ

দাওয়া থেকে চীনকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। সুনের আগ্রহে ১৯২৪ সালে কুওমিনটাং অর্থাৎ চীনের জাতীয় দলে কমিউনিস্টদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এর আগের বছর কুওমিন্টাঙের সঙ্গে বিপ্লবী রাশিয়ার মৈত্রীর ভিত্তি রচিত হয়েছিল। এই ভাবে চীনের দুটি বিপ্লবী সংস্থার পক্ষে একযোগে কাজ করবার পথ খুলে গিয়েছিল।

চীনকে সাহায্য করার জন্য রাশিয়া থেকে দু'জন উপদেষ্টা এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন উঁচু রকমের কূটনীতিতে বিশারদ। তাঁর নাম মিখায়েল বোরোদিন। তিনি রাশিয়ার সাম্যবাদী দলের অনুকরণে কুওমিন্টাং দলকে পুরোপুরি ঢেলে সাজান ; যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষক ও ছাত্র, কৃষক, মজুরদের সাহায্য লাভ করা যায়। সেজন্য দক্ষিণ চীনে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য চালাবারও ব্যবস্থা হল।

রাশিয়ার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন ভেসেলি ব্লসের। গ্যালেন নামেও তিনি অধিক পরিচিত হন। তিনি কুওমিন্টাং দলের লোকদের সামরিক

বদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। এজন্য তিনি ক্যান্টনের কাছে ওয়াম্পোতে একটি সামরিক বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে সুন্ তাঁর সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ যুবক চিয়াং কাই শেক-কে যুদ্ধশাস্ত্রে শিক্ষা-লাভ করার জন্য মস্কোতে পাঠিয়েছিলেন। চিয়াং স্বদেশে ফিরে এসে ওয়াম্পোর সামরিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এদিকে মাও জে-তুঙ হয়েছিলেন কৃষিদপ্তর এবং কৃষক আন্দোলন প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ এবং সেই সঙ্গে তিনি প্রচার-বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। তখন মধ্য ও উত্তর চীনে সামরিক অভিযানের প্রয়োজনীয় সব কিছুই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় হঠাৎ সুন্-এর মৃত্যু হয়।

চিয়াং কাই-শেক-এর কমিউনিস্ট নিপীড়ন-নীতি

সুন্-এর মৃত্যুর পর বোরোদিন চিয়াং কাই শেক-কে কুওমিন্টাঙের সর্বাধিনায়করূপে মেনে নেন। ১৯২৬ সালে তাঁর নেতৃত্বে কুওমিন্টাং কমিউনিস্ট যুক্তবাহিনী দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ অঞ্চলে জয় লাভ করে। কুওমিন্টাং দলের অনেক সভ্য মার্কসবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে একত্র হয়ে মধ্য চীনের বড় শহর হ্যাঙ্কাও-তে চীনের রাজধানী স্থাপন করেন।

কুওমিন্টাঙের উদারপন্থী সদস্যরাও কমিউনিস্টদের ত্যাগ করে চিয়াং-এর দলে ভীড়ে যায়। চিয়াং ক্রমে বিজিং দখল করে চীনের অধিকাংশ নিজের অধীনে আনেন। তারপর থেকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ পরিত্যাগ করে চীন থেকে কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ উৎখাতের কাজে লেগে গেলেন। রুশী উপদেষ্টাদের দেশে ফিরে যেতে হল।

কমিউনিস্টদের নির্মূল করা কিন্তু সহজ হল না। তারা মাও জে-তুঙের নেতৃত্বে দক্ষিণ চীনের ভূমিহারা দুর্বল, দরিদ্র, নিপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকদের সুসংগঠিত করে তুলেছিল। এই সকল মানুষদের সাহায্যে কমিউনিস্টরা দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চল দখল করে নেয়। সেই সব জায়গায় তারা রাশিয়ার অনুকরণে অনেকগুলি গ্রামীণ সোবিয়েত সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। এদের রক্ষা করার জন্য ১৯২৮ সাল থেকে "লাল ফৌজ"এর সংগঠনও শুরু হয়ে যায়।

১৯৩০-৩৪ সালের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পাঁচটি বড় বড় সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। এর প্রথম চারটিতে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। পঞ্চম অভিযানের সময় চিয়াং একজন বিচক্ষণ জার্মান সেনাপতির সাহায্যে কুওমিন্টাং সৈন্যবাহিনী

পুনর্গঠন করেন। এবার তিনি এক নতুন রণকৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, খোলা জায়গায় যুদ্ধ করে লাল ফৌজকে হারান যাবে না। তাই তিনি নতুন নতুন রাস্তাঘাট ও তার পাশে পাশে দুর্গ নির্মাণ করে বিপক্ষদলীয় সৈন্যদের অবরোধ করে রাখলেন।

সুদীর্ঘ পরিক্রমণ

মাও দেখলেন কমিউনিস্টদের দক্ষিণ চীনে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই তিনি তাদের চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সেনসি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু সেখানে সোজা পথে যাওয়ার মানেই হোল চিয়াং কাই-শেকের শিকার হওয়া। তাই তিনি ঘোরা পথে যেতে সঙ্কল্প করেন। এই পথ ছিল ছ'হাজার মাইল বিস্তৃত এবং অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। নানা রকমের বাধাবিঘ্ন ছিল অন্তরায়, যেমন—হিমাদ্রি আবৃত শৈলশিখর, খরস্রোতা নদী, বন-জঙ্গল, তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত মাঠ, জলাভূমি প্রভতি। তাছাড়া এদের বাধা দেবার জন্য চিয়াং কাই-শেকের অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য নিয়োজিত ছিল। তখন কমিউনিস্ট সৈন্যদের না ছিল পর্যাপ্ত খাদ্য, না ছিল জুতো-জামা। অর্ধ-নগ্ন ক্লান্ত দেহে এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে অবশেষে তারা গন্তব্য স্থলে পেঁাছে যায়। মাও জে-তুঙ এবং তাহার উচ্চপদস্থ সহ-কর্মীরাও এই একই ভাবে এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেন। তাদের জন্য কোন পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল না। পথের কষ্টে, হিমবাহের চাপে, জলে ডুবে এবং চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যদের আক্রমণে কমিউনিস্টদের অসংখ্য সৈন্য ও তাদের অনুগামী সাধারণ শ্রেণীর লোক মারা যায়। কিন্তু এই সকল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের মনোবল ভেঙে পড়েনি। তারা স্থির লক্ষ্যে ঠিকই পেঁাছেছিল। তাই তাদের এই সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমণের কাহিনী মহাকাব্যের মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

সিয়ান-ফুর ঘটনা

১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে সেখানে তাদের তত্ত্বাবধানে একটি পুতুল সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু এর প্রতিবিধানের জন্য চিয়াং কাই-শেক কিছুই করলেন না। কমিউনিস্টরা প্রস্তাব দিল যে, আবার তারা জাতীয়বাদীদের সঙ্গে একত্র হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু চিয়াং জাপানের চেয়েও কমিউনিস্টদের বড় শত্রু বলে মনে করতেন। ১৯৩৬ সালে চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আবার একটি অভিযান চালান। মাঞ্চুরিয়ার নির্বাসিত নেতা চ্যাঙ সুয়েলিয়াঙ ছিলেন

চিয়াং-কাই-শেকের উপ-সেনাধ্যক্ষ। তিনি কমিউনিস্ট প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য জিদ করতে থাকেন। চিয়াং কাই-শেক অস্বীকৃতি জানালে চ্যাঙ তাকে গ্রেপ্তার করেন। তখন মুক্তি লাভের জন্য কমিউনিস্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী দল ও কমিউনিস্টদের সম্মিলিত মোর্চার যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান জড়িয়ে পড়বার পর কমিউনিস্টদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের মিত্রতা কিছু শিথিল হয়ে পড়ে। তার কারণ চিয়াং কাই-শেখ এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং সহযোগিতা লাভ করে। ফলে তাঁকে আর কমিউনিস্টদের উপর নির্ভর করতে হলো না। কিন্তু কমিউনিস্টরা তাদের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ক্রমেই তাদের প্রভাব বাড়াতে থাকে। ১৯৪৫ সালে জাপান আত্ম-সমর্পণ করলে আবার জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের গৃহ-যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পরিচালিত গেরিলা বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-চীন ছেয়ে ফেলেছিল। ১৯৪৮ সালে মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও মাঞ্চুরিয়ায় চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয়। তার পরের বছর কমিউনিস্টবাহিনীর আক্রমণের ফলে চিয়া: কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চিয়াং কাই-শেখ ফরমোসায় (তাইওয়ান) পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন চীনের অবশিষ্ট ভূখণ্ডেও কমিউনিস্টদের শাসন প্রবর্তিত হলো। এইভাবে চীনে বর্তমান গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব

ইন্দোচীন

ইন্দোচীন ফরাসীদের উপনিবেশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জাপানীরা এই অঞ্চলটি অধিকার করে। তারা পরাজিত হলে বিশ্ববিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা ডঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে এখানে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার নাম দেওয়া হয় ভিয়েতনাম। ডঃ হো-চি-মিনই হলেন এই রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ফরাসীরা ফিরে আসে এবং ভিয়েতনামের স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তখন ভিয়েতনামের অধিবাসীরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাতে থাকে। একটি বড় রকমের যুদ্ধে ফরাসীরা দারুণ ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৫৪ সালে দু-পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জেনেভাতে একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিয়েতনামকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়—উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। উত্তর ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত হল হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী সরকার।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে সম্রাট বাওদাই ফরাসী প্রভাবাধীনে থেকে সরকার চালাতে লাগলেন। কিন্তু এখানকার ভিয়েতকঙ নামে সাম্যবাদী গেরিলারা সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে দিনে দিনে ফরাসীপ্রভাব কমে যায়, তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখানকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট প্রসার রোধ করতে পারল না। ক্রমে উত্তর ভিয়েতনামও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে প্রায় পনের বছর কেটে যায়। মুক্তিকামী ভিয়েতনামীদের সঙ্গে অমিতবলশালী আমেরিকাও এঁটে উঠতে পারল না। অপরদিকে এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমেরিকার জনগণের মনে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে আমেরিকাকে শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনাম থেকে সরে যেতে হ'ল। তখন মহান্ নেতা হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সমগ্র ভিয়েতনাম বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল।

কম্বোডিয়া ও লাওসের স্বাধীনতা ঘোষণা

ফ্রান্স ও ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে লাওস ও কম্বোডিয়ার রাজারাও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৯৫৪ সালের জেনেভা

সম্মেলন ঐ দুই দেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। বর্তমানে ঐ দুটি রাজ্যেই কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়েছে।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশ জয় করে তাকে ভারতবর্ষের একটি প্রদেশে পরিণত করেছিল। ঐ সময়ে শিক্ষিত ব্রহ্মবাসীরা ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে জাপান ব্রহ্মদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশ জয় করে নেয়। তখন জাপানীরা ঘোষণা করে যে, এশিয়ায় শুধু এশিয়াবাসীরাই থাকবে এবং এখানকার সম্পদ ও সমৃদ্ধির সকলেই সমভাগী হবে। কাজেই ব্রিটিশ-বিরোধী নেতা বা ম এবং অউঙ্গসান জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। কিন্তু অচিরেই জাপানীদের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা এবং দেশের সম্পদহরণ নেতাদের চোখ খুলে দেয়। তখন থেকেই ব্রহ্মদেশে জাপানী বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনকে সার্থক করে তোলবার জন্যে অউঙ্গসান 'ফ্যাসি-বিরোধী জনগণের মুক্তিসংঘ' নাম দিয়ে একটি নতুন দল গঠন করলেন। এর ফলে ইংরাজদের পক্ষে ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করা সহজ হয়ে গেল। অউঙ্গসানের সংগ্রামীদলের প্রচেষ্টায় ব্রহ্মবাসীরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কাজেই তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ইংরাজদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হ'ল না। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভ

ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে একটি লম্বা ছাঁদের উপদ্বীপ আছে। এর দক্ষিণ অংশের নাম মালয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মালয় অঞ্চলটি দখল করে নিয়েছিল। ইংরাজদের রাজত্বকালে এখানে বহু ভারতীয় ও চৈনিক বংশজাত শ্রমিক ও ব্যবসায়ীর ভীড় জমে। দেশীয় মালয়ীদের সঙ্গে এইসব বিদেশীদের খুব একটা সদ্ভাব ছিল না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিভেদের কারণে সেখানে জাতীয় আন্দোলন সেরকম দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। চীন ছিল জাপানীদের শত্রু। তাই জাপানীরা এদেশের চীনা অধিবাসীদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাত। ভারতীয়রাও জাপানী অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। পরে ঐ অঞ্চলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমনের ফলে ভারতীয়দের অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু

জাপানী অত্যাচারে উৎপীড়িত চীনারা বনেজঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সেখানে তারা একটি জাপান-বিরোধী সেনাবাহিনী গঠন করে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের পর ইংরাজদের পক্ষে মালয় পুনর্দখল করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় থেকে সকল জাতির মালয়বাসী স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দাবি করতে থাকে। তখন এখানকার কমিউনিস্ট দল বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। অবশেষে ১৯৬৩ সালে ইংরাজরা একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে মালয়বাসীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে।

ইন্দোনেশিয়ায় গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা

ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচ্‌দের উপনিবেশ। এখানকার ধনদৌলত নিজেদের দেশে পাচার করাই ছিল ডাচদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এখানকার অধিবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এখানেও একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাদের নেতৃত্বে ১৯২৬ সালে একটি বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ডাচ সরকার কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করে।

এই পরিস্থিতিতে ইন্দোনেশিয়ায় একজন নতুন নেতার আবির্ভাব হয়। তিনি হলেন ডঃ সুকর্ণ। তিনি একটি নতুন দল গঠন করে স্বাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চালাতে থাকেন। এই অপরাধে ১৯৩৪ সালে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। জাপানী আক্রমণ পর্যন্ত এইভাবেই কাটে। জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করে নেতাদের মুক্তি দেয়। ব্রহ্মদেশের নেতাদের মত ইন্দোনেশিয়ার নেতারাও প্রথমে জাপানীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা গুপ্তভাবে জাপানবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল। সুকর্ণ এবং তাঁর সহযোগীরা তলে তলে এদের সাহায্য করতেন। যুদ্ধের শেষ দিকে ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত জাপানী সেনাবাহিনী ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুকর্ণ তখন স্বদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। ইংরাজরা তা মেনে নিল। কিন্তু ডাচরা ফিরে এসে ইন্দোনেশিয়ায় তাদের নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া তাদের লক্ষ্যে অবিচল হয়ে রইল। অবশেষে ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন হয়ে ডাচরা শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যে প্রেরণালাভ করে বিশ্বে অন্যান্য পরাধীন জাতিগুলিও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার পরাধীন আরব দেশগুলি স্বাধীন হয়। ১৯২২ সালে ইংরাজরা মিশরকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষার ভার তারা ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিশরে একজন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম আব্দুল নাসের। ১৯৫৪ সালে তিনি মিশরের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। তখন ইংরাজদের মিশর থেকে চলে যেতে হয়।

নাসেরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে কেবল মিশর নয়, সমস্ত আফ্রিকাবাসীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। এখন একমাত্র নামেবিয়া ও পশ্চিম উপকূলস্থ কয়েকটি দ্বীপ ছাড়া সমস্ত আফ্রিকাবাসীরা স্বাধীন হয়েছে। আফ্রিকার এই নবজাগরণ বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

অতলান্তিক সনদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কি আদর্শের জন্য ইংলণ্ড ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ করছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য ১৯৪১ সালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস নামে একটি জাহাজে। এই সাক্ষাৎকারের পর একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। তাতে কতকগুলি ভাল ভাল নীতির উল্লেখ ছিল; যেমন—সকল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবিস্তার থেকে বিরত থাকবে; পরাধীন রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে এবং তারা তখন নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করতে পারবে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সকলের সমান অধিকার রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং বিশ্বে শান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টার কথাও বলা হ'ল। এই বিজ্ঞপ্তিগুলিই আটলান্টিক চার্টার বা অতলান্তিক সনদ নামে পরিচিত।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা

অতলান্তিক সনদের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রায় চার বছর পরে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্চাশটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিসকো শহরে মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতি-সংস্থার (U.N.O.) প্রতিষ্ঠা করেন। আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই হ'ল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের আরও কয়েকটি উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। যেমন, সম অধিকার এবং প্রত্যেকের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ানো এবং জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে মানবিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে জাতিসংস্থার অধীনে ছয়টি পৃথক্ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে সাধারণ পরিষদ; নিরাপত্তা পরিষদ; এবং আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীনে আসে। এই বিশাল অঞ্চলে এবং পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বিরাট চীন দেশে, মঙ্গোলিয়ায়, উত্তর কোরিয়ায়, ভিয়েত-নামে এবং আমেরিকার নিকট কিউবায় সর্বাত্মক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব দেশে একমাত্র কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য কোন দল নেই। তাই অনেকে এদের গণতন্ত্রবিরোধী বলে মনে করে থাকেন। আবার আর একদল সমাজতন্ত্রী আছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন রকম বাধা সৃষ্টি করার পক্ষপাতী নন। এই রকম দল পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল পরাধীন জাতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছে তাদের অনেকেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে আস্থাবান। এইভাবে এখন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র-বাদীরা সকলেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, বর্ণবৈষম্য ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছেন। আমাদের দেশ ভারতও এই একই আদর্শ গ্রহণ করেছে।

প্রথম অধ্যায়

১। (ক) ইতিহাসে বণিকযুগ বলতে কোন্ যুগকে বোঝায়?

(খ) বর্তমান যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে কোন্ মতবাদকে আশ্রয় করে?

(গ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সুবর্ণ যুগ বলতে কোন সময়কে বোঝায়?

(ঘ) গম পেষাই করার নতুন রীতি কোন্ দেশে প্রথম আবিষ্কৃত হয়?

(ঙ) ইওরোপে নতুন নতুন কি কি শস্য ও শাক-সব্জি চাষের প্রবর্তন হয়েছিল?

(চ) এই নতুন নতুন ফসলের চাষের বিষয় তারা কাদের কাছ থেকে জানতে পারে?

২। কিভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের সূচনা হয়েছিল দেখাও।

৩। সামন্তদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ কি?

৪। মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষ কিভাবে চাষ-আবাদ করত? পরবর্তীকালে কোন্ কোন নতুন পদ্ধতি কৃষির উন্নতির সহায়ক হয়েছিল?

৫। কিভাবে মধ্যযুগের শেষের দিকে ইওরোপে একটা ছোটখাটো শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়? শিল্পোন্নয়নের প্রভাব সমাজ-ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন এনে দিয়েছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। (ক) মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের ওপর কিসের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি?

(খ) যাজকেরা সাধারণ মানুষদের কি শেখাতেন?

(গ) কখন থেকে ইওরোপে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে?

(ঘ) ইওরোপে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের চর্চা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে কি কারণ ছিল?

(ঙ) রেনেসাঁস কথাটির অর্থ কি?

২। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য পাঠ করে ইওরোপের মানুষের চিন্তাধারায় কি পরিবর্তন এসেছিল?

৩। রেনেসাঁসের উদ্ভব প্রথম কোন্ দেশে হয়েছিল? কারা কিভাবে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে রেনেসাঁসের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। (ক) ইওরোপে যাঁরা নব যুগের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের কি বলা হয়?

(খ) মানবতাবাদ কাকে বলে?

(গ) ইওরোপীয় ভাষাগুলির দ্রুত উন্নতির কারণ কি?

(ঘ) কবিতায় চতুর্দশপদী রীতির প্রবর্তক কে?

(ঙ) দি ডিভাইন কমেডিয়া গ্রন্থটি কার লেখা?

(চ) কোন্ গ্রন্থ থেকে দান্তের রাজনৈতিক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়?

(ছ) ইওরোপের কোন্ কূটনীতিবিদ্‌কে মৌর্যযুগের চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে?

(জ) কার লেখা কোন্ বই শেক্সপীয়রকে প্রেরণা জুগিয়েছিল?

(ঝ) চসারের লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কর।

(ঞ) শেক্সপীয়রের লেখা দুটি নাটকের নাম বল।

(ট) মোনালিসা ছবিটি কার আঁকা?

(ঠ) রাফায়েলের আঁকা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছবি কোন্‌টি?

(ড) সূর্য স্থির, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—এই সত্যটি ইওরোপে কে প্রথম আবিষ্কার করেন?

(ঢ) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে?

২। ইংলণ্ডে নবযুগের ভাবধারার প্রসারে একজন ইংরাজ কবি ও সাহিত্যিক এবং ইংরাজ বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ কর।

৩। ইতালীর দুজন কবি ও সাহিত্যিকের নাম কর। মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রসারে তাঁদের অবদান কি?

৪। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দাও।

৫। টীকা লিখ ঃ—

(ক) মেকিয়াভেলী; (খ) স্যার ফ্রান্সিস বেকন; (গ) এমডণ্ড স্পেন্সর; (ঘ) এরাস-মাস; (ঙ) মাইকেল এঞ্জেলো; (চ) কোপারনিকাস।

৬। সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) ডেকামেরণ গ্রন্থের রচয়িতা ফ্রান্সিস্ বেকন/বোকাশিও/চসার।

(খ) দি ফেয়ারি কুইন রচনা করেছিলেন এডমণ্ড স্পেন্সর/শেক্সপীয়র/এরাসমাস।

(গ) দি লাস্ট সাপার চিত্রটি অঙ্কন করেন রাফায়েল/মাইকেল এঞ্জেলো/লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

(ঘ) নদীর ওপর ব্রীজ তৈরীর কারিগরী কৌশল সে যুগের মানুষকে প্রথম শিখিয়ে-ছিলেন গুটেনবার্গ/লিওনার্দো দা ভিঞ্চি/গ্যালিলিও।

(ঙ) রহবেলা ছিলেন ফ্রান্স/ইতালী/ইংলণ্ডের মানুষ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের ওপরে টিক্ (√) চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) পর্তুগালের রাজপুত্র (আলবুকার্ক/হেনরী/ক্যাব্রাল) ছিলেন সে যুগে সামুদ্রিক অভিযানের একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক।

(খ) ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন (১৪৯৮/১৫০৩/১৫০৬) সালে।

(গ) স্পেনের রানী ইসাবেলা ৩ খানি ছোট জাহাজ ও ১০০ জন সঙ্গী দিয়ে (কলম্বাস/বালবোয়া/বার্থেলোমিউ দিয়াজ) কে সাহায্য করেছিলেন।

(ঘ) আফ্রিকার শেষ প্রান্তের নাম ঝড়ের অন্তরীপ দিয়েছিলেন (পর্তুগালের রাজা/বার্থেলোমিউ দিয়াজ/প্রিন্স হেনরী)।

২। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন্ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষের সমুদ্রযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল?

(খ) উত্তমাশা অন্তরীপ নামকরণের কারণ কি?

(গ) আমেরিকা মহাদেশটির অস্তিত্ব ইওরোপবাসীদের কাছে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কবে?

(ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায় যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তা কোন্ জাতির সৃষ্টি?

(ঙ) কার নির্দেশে পৃথিবীর ওপর একটি কাল্পনিক রেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল?

(চ) কে মেক্সিকো জয় করে সেখানে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন?

(ছ) পেরুতে স্পেনের আধিপত্য কে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৩। কি উদ্দেশ্যে পর্তুগাল ও স্পেনের দুঃসাহসী নাবিকেরা দলে দলে জাহাজ নিয়ে অকূল সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল?

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল?

৫। টীকা লিখ :

(ক) কলম্বাস; (খ) ভাস্কো দা গামা; (গ) বালবোয়া; (ঘ) ম্যাজেলান।

চতুর্থ অধ্যায়

১। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি?

২। মুক্তিপত্র কাকে বলে? কে এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং কেন?

৩। অষ্টম হেনরীর সঙ্গে পোপের বিবাদের কারণ কি?

৪। ইংলণ্ড থেকে পোপের প্রভাব খর্ব করার জন্য অষ্টম হেনরী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

৫। সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল?

৬। ক্যাথলিকেরা নিজেদের দোষত্রুটীগুলি দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

৭। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধের বিবরণ দাও।

৮। নেদারল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ দূর করার জন্য দ্বিতীয় ফিলিপ কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

৯। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের মনোমালিন্যের কারণ কি?

১০। স্প্যানিশ আর্মাডার পরাজয়ের কারণ কি?

১১। একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) ওয়াইক্লিফের অনুগামীরা কি নামে পরিচিত ছিলেন?

(খ) কে কাকে 'ধর্মরক্ষক' উপাধি দিয়েছিলেন?

(গ) লুথার মতাবলম্বী খ্রীষ্টানরা কি নামে পরিচিত হয়েছিলেন?

(ঘ) বিধর্মীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন?

(ঙ) পোপ একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। নিষিদ্ধ পুস্তক বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?

(চ) ডায়েট কাকে বলে?

(ছ) লুথারপন্থীদের প্রোটেস্টান্ট বলা হোত কেন?

১২। টীকা লিখ ঃ

(ক) জন হাস ; (খ) জেসুইট সোসাইটি ; (গ) অগ্‌স্‌বার্গ চুক্তি ; (ঘ) স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী।

পঞ্চম অধ্যায়

১। স্টুয়ার্ট যুগে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবাদের কারণ কি?

২। প্রথম চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতার বিবরণ দাও।

৩। গৌরবময় বিপ্লবের কারণ কি? ঐ বিপ্লবকে গৌরবময় বলা হয় কেন?

৪। বিল অব্‌ রাইটস কিভাবে রাজার ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছিল?

৫। টীকা লিখ ঃ

(ক) দীর্ঘ পার্লামেন্ট ; (খ) ক্রমওয়েল ; (গ) প্রথম জেমস।

৬। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) স্টুয়ার্ট রাজারা নিজেদের কি মনে করতেন?

(খ) দীর্ঘ পার্লামেন্ট নামকরণের কারণ কি?

(গ) কবে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়?

(ঘ) ক্রমওয়েল কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন?

(খ) কোন্‌ যুদ্ধে শের খাঁ হুমায়ুনকে পরাজিত করেছিলেন?

(গ) কোন্‌ যুদ্ধে রাণা প্রতাপ মুঘলদের হাতে পরাজিত হন?

(ঘ) ঔরঙ্গজেব কত সালে কোথায় প্রাণত্যাগ করেন?

২। সঠিক উত্তরের পাশে টিক্‌ (√) চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের হাতে পরাজিত হন (সংগ্রাম সিংহ/রাণা প্রতাপ/শের খাঁ)।

(খ) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয় (১৫২৬/১৫৩০/১৫৫৬) খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) গণ্ডোয়ানার রানীর নাম (দুর্গাবতী/জিজাবাঈ/লক্ষ্মীবাঈ)।

(ঘ) ঔরঙ্গজেবের সময় শিখগুরু (গোবিন্দ সিং/অর্জুন সিং/তেগবাহাদুর) ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন।

(ঙ) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন ঔরঙ্গজেবের পুত্র (মুয়াজ্জেম/জাহান্দার শাহ্‌/শাহ্‌ আলম)।

৩। বাবর কিভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৪। আকবরের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দাও।

৫। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজেবকে কতখানি দায়ী করা যায়?

৬। শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর।
৭। মুঘল আমলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। একটি বাক্যে উত্তর দাওঃ

(ক) পর্তুগীজদের পর কোন্ ইওরোপীয় জাতি ভারতে ব্যবসা করতে আসে?
(খ) ১৬৭৪ সালে শিবাজী কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?
(গ) পেশোয়া কাকে বলে?
(ঘ) কত সালে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়?
(ঙ) কে প্রথম শিখজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেন?
(চ) বালাজী বাজীরাও-এর পর কে পেশোয়া হয়েছিলেন?

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

(ক) ওলন্দাজরা প্রথম গুজরাটের —— কুঠি ও কেল্লা স্থাপন করে।
(খ) —— নামে পণ্ডিচেরীর এক ফরাসী শাসনকর্তা সর্বপ্রথম ভারতে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।
(গ) ১৭৬১ সালে —— যুদ্ধে লালী ইংরাজদের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হন।
(ঘ) ১৬৭৪ সালে —— রাজ্যাভিষেকের পর শিবাজী —— উপাধি গ্রহণ করেন।
(ঙ) শম্ভুজীর মৃত্যুর পর শিবাজীর আর এক পুত্র —— ও তাঁর স্ত্রী—— মারাঠাদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন।
(চ) ১৭২০ সালে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর পেশোয়া হলেন তাঁর পুত্র —
(ছ) —— নামে একজন আফগান রাজা শিখনেতা ——কে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
(জ) মারাঠাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলা হোত ——।

৩। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল তার বিবরণ দাও।

৪। শিবাজীর মৃত্যুর পর কাদের নেতৃত্বে এবং কিভাবে মারাঠারা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল?

৫। রণজিৎ সিংহের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর।

৬। টীকা লিখঃ—

(ক) দুপ্লেক্স; (খ) বালাজী বাজীরাও; (গ) আহমদ শাহ আবদালী; (ঘ) বালাজী বিশ্বনাথ।

সপ্তম অধ্যায়

১। একটি বাক্যে উত্তর দাওঃ—

(ক) সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কারা কারা লিপ্ত ছিল?
(খ) কার বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ঘটেছিল?
(গ) মীরজাফরের পর কে বাংলার মসনদে বসেছিলেন?
(ঘ) করদ-মৈত্রী নীতির প্রবর্তক কে ছিলেন?

(ঙ) স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেছিলেন?
(চ) সিপাহী বিদ্রোহের একমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ কি?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) মীরজাফর যখন আর টাকা জোগাতে পারলেন না তখন ইংরাজরা তাঁকে সরিয়ে তাঁর জামাতা ——কে বাংলার সিংহাসনে বসাল।
(খ) ১৮১৫ সালে —— সন্ধিতে গুর্খারা তাদের অনেকগুলি অঞ্চল ইংরাজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।
(গ) একটি ঘোষণা দ্বারা ১৮৪৯ সালে —— পাঞ্জাবকে ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।
(ঘ) ব্যারাকপুরে —— নামে এক সিপাহী ব্যক্তিগতভাবে প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
(ঙ) ঝাঁন্সীর রানী —— নানাসাহেবের সেনাপতি ——র সঙ্গে মিলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

৩। টীকা লিখ ঃ

(ক) দ্বৈতশাসন; (খ) করদ-মৈত্রী নীতি; (গ) স্বত্ববিলোপ নীতি; (ঘ) বক্সারের যুদ্ধ; (ঙ) মীরকাসিম; (চ) টিপু সুলতান।

৪। পলাশীর যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কতখানি?
৫। ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক আলোচনা কর।
৬। ডালহৌসী কিভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করেছিলেন?
৭। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি? এই বিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বলা চলে কি?
৮। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কি?
৯। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী —— স্ট্যাম্প অ্যাকট নামে একটি আইন চালু করেন।
(খ) স্ট্যাম্প আইন তুলে দেন ——।
(গ) বিদ্রোহীরা ১৮ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করে তার নেতৃত্ব দিল —— নামে এক সেনাপতিকে।
(ঘ) বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ——।

২। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) ইংলণ্ডের কোন্ মন্ত্রী চা, কাচ, কাগজ, রঙ্ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসের ওপর কর বসিয়েছিলেন?
(খ) কে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট তুলে দিয়েছিলেন?
(গ) বিদ্রোহের সময় জাহাজের সমস্ত চা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার পর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কোথাকার স্বায়ত্তশাসন অধিকার বাতিল করে দিয়েছিলেন?

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ কি?
৪। স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের সাফল্যের কারণ কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) যন্ত্রচালিত মাকু কে উদ্ভাবন করেছিলেন?
(খ) সেফ্‌টি ল্যাম্পের আবিষ্কর্তা কে?
(গ) জেমস্ ওয়াট কি জন্য বিখ্যাত?

২। বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের ওপরে টিক্ (✓) চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) স্পিনিং জেনি আবিষ্কার করেন (আর্করাইট/হারগ্রীভস/টাউনশেন্ড)।
(খ) আগে লোহা গালাই করা হ'ত (কাঠ/কাঠ কয়লা/পাথ্‌রে কয়লা) দিয়ে।
(গ) কে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভেড়ার উন্নতি করেছিলেন? (বেকওয়েল/জন কে/টুল)

৩। শিল্প বিপ্লবের কারণ কি?
৪। ইংলণ্ডে বয়নশিল্পের উন্নতির পেছনে কাদের অবদান ছিল?
৫। শিল্প বিপ্লবের ফলে কিভাবে কৃষির উন্নতি হয়েছিল?
৬। ইংলণ্ডের সমাজজীবনের ওপর শিল্পবিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) বহুকাল থেকে ফ্রান্সে —— বংশের রাজারা দেশ শাসন করতেন।
(খ) —— নামে বিখ্যাত গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
(গ) মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সব রকমের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করাই ছিল —— জীবনের ব্রত।
(ঘ) Spirit of Laws গ্রন্থের রচয়িতা ——।

২। সমাজের শ্রেণী-বৈষম্য ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ।—আলোচনা কর।
৩। ফরাসী দার্শনিকেরা কিভাবে বিপ্লবের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিলেন?
৪। ফ্রান্সের জমিদার ও যাজকশ্রেণীর লোকেরা কিভাবে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাতেন?
৫। বিপ্লবীদের সঙ্গে ইওরোপীয় রাজাদের যুদ্ধের বিবরণ দাও।
৬। নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর।
৭। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী অবদান কি?

নবম অধ্যায়

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ——।
(খ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তা —— নামে প্রসিদ্ধ।

(গ) চতুঃশক্তির প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে যে হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা —— নামে প্রসিদ্ধ।
(ঘ) ইতালীতে —— নামে এক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
(ঙ) দক্ষিণ ইতালীর সিসিলি ও নেপল্‌স্‌ মুক্ত করেন —— নামে ইতালীর একজন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা।
(চ) ১৮৭০ সালে —— যুদ্ধে ফ্রান্স প্রাশিয়ার নিকট পরাজিত হ'ল।
(ছ) দাসদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ আমরা পাই —— প্রণীত আঙ্কল টমস কেবিন নামক বইতে।
(জ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন ——।

২। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন্‌ মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে পবিত্র চুক্তি রচিত হয়েছিল?
(খ) কনসার্ট অব ইওরোপ কাকে বলে?
(গ) কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্রের মধ্যে চতুঃশক্তি মৈত্রী গঠিত হয়েছিল?
(ঘ) কি উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপের নীতি গৃহীত হয়েছিল?
(ঙ) কে কি উদ্দেশ্যে নবীন ইতালী নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন?
(চ) কোন্‌ তিনটি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন করেছিলেন?
(ছ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লিঙ্কনের বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছিলেন?
(জ) ধনীদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এমন দুজন চিন্তানায়কের নাম কর।
(ঝ) ইংলণ্ডে থাকাকালীন কার্ল মার্ক্স যে আর একজন জার্মানবাসীর বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর নাম কি?

৩। মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দাও।
৪। ইতালীর ঐক্য সাধনের পশ্চাতে ম্যাৎসিনি ও কাভুরের অবদান উল্লেখ কর।
৫। কিভাবে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্য সাধন করেছিলেন?
৬। ঐক্য সাধনের পূর্বে ইতালী ও জার্মানীর অবস্থা কিরকম ছিল?
৭। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ কি?
৮। ইওরোপের শিল্পায়ন সমাজের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিল?
৯। ধনীদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের ভূমিকা আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

১। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) ১৮৪২ সালে ইংরাজ ও চীনাদের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যে সন্ধি হয়েছিল তার নাম কি?
(খ) তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? বিদ্রোহীদের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল?
(গ) চীনের নতুন সাধারণতন্ত্রের প্রথম অস্থায়ী সভাপতি কে হয়েছিলেন?
(ঘ) জাপানে 'শোগান' কাদের বলা হোত?
(ঙ) জাপানের বেতনভোগী সৈন্যদের কি বলা হোত?
(চ) আমেরিকার কোন্‌ নৌ-সেনাপতি জাপানের কাছ থেকে সে দেশে ব্যবসা করার অনুমতি আদায় করে নিয়েছিলেন?

(ছ) চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে যে সন্ধি হয় তার নাম কি?
(জ) একুশ দফা দাবি কে কার কাছে করেছিল?
২। দুটি অহিফেন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
৩। বিদেশীরা কিভাবে চীনদেশের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিল?
৪। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল?
৫। জাপানের তরুণ সম্রাট মাৎসুহিতোর আমলে যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায় তার পরিচয় দাও।
৬। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৭। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৮। টীকা লিখ:

(ক) তাইপিং বিদ্রোহ; (খ) বক্সার বিদ্রোহ; (গ) খোলা দরজার নীতি; (ঘ) সুন্ ইয়াৎ-সেন; (ঙ) কমোডর পেরি।

একাদশ অধ্যায়

১। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে আফগানিস্তান পরাজিত হয়ে ইংরাজদের সঙ্গে —— সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
(খ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন ——।
(গ) ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক এক আদেশ জারি করে ——কে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দিলেন।
(ঘ) —— শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে প্রমাণ করেছিলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত।
(ঙ) বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মিলে —— নামে একটি সমিতি গঠন করেন।
(চ) ১৮৮৫ সালে —— নামে এক সদাশয় ইংরাজ বড়লাট ডাফরিণের সমর্থন নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
(ছ) কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থী দলের উদ্ভব হয়েছিল তার নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের ——, বাংলার —— ও —— এবং পাঞ্জাবের ——।

২। বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের ওপরে টিক্ (√) চিহ্ন বসাও:

(ক) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/হিউম)
(খ) সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (কৃষ্ণকুমার মিত্র/হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়/অরবিন্দ ঘোষ)
(গ) ১৯০৫ সালে ঢাকার অনুশীলন সমিতির পত্তন করেন (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ/পুলিন দাস/পি. মিত্র)

৩। আফগানিস্তান ও তিব্বতে ইংরাজরা কিভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল?
৪। সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখ কর।
৫। বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে লর্ড কার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য ভারতীয় নেতৃবর্গ কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন?

৬। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। কিভাবে ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল তার বিবরণ দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ভীষণতার পরিচয় দাও।

৪। একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

(ক) অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার বিরোধে রাশিয়া কোন্ পক্ষকে সমর্থন করেছিল?

(খ) বসনিয়া ও হারজিগোভিনা কেন সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি কামনা করছিল?

(গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি বলতে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে বোঝাত?

(ঘ) মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র যুদ্ধ করেছিল?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা কি?

(খ) কার্ল মার্ক্স কি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন?

(গ) বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা কি রকম ছিল?

২। বলশেভিকরা কিভাবে রাশিয়ায় নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল?

৩। রুশ বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণগুলি আলোচনা কর।

৪। রুশ বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি পর্যালোচনা কর।

৫। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লব কি প্রভাব বিস্তার করেছিল?

চতুর্দশ অধ্যায়

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে যেসব সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাদের মধ্যে জার্মানীর সঙ্গে —— সন্ধিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী —— গঠিত হয়েছিল।

(গ) ফ্যাসিবাদের মূল নীতি অনুসারে —— ইতালীতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে কিছুই রইল না।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ও পরাজিত দেশগুলির মধ্যে কি কি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

৩। শান্তি চুক্তির নীতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে বিজয়ী রাষ্ট্রের নেতাদের কিরকম মনোভাব ফুটে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই মনোভাবকে কার্যকর করতে তাঁরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

৪। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা কর।

৫। ফ্যাসিবাদের মূল কথা কি? ইতালী ও জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উত্থান কিভাবে হয়েছিল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) স্পেনে —— নেতৃত্বে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

(খ) হিটলার ১৯৩৬ সালে জাপানের সঙ্গে —— চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলেন।

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল হিটলারের —— আক্রমণ।

(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম আণবিক বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল জাপানে —— ও —— ওপরে।

২। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেসব সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।—আলোচনা কর।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারকে কতখানি দায়ী করা যায়?

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

ষোড়শ অধ্যায়

১। **একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

(ক) রাউলাট আইনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল?

(খ) জালিয়ানওয়ালাবাগে কোন্ ইংরাজ সেনাপতি গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

(গ) কিসের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন?

(ঘ) মুসলমান জগতের প্রধান ধর্মগুরু কি নামে পরিচিত ছিলেন?

(ঙ) অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী কি ছিল?

(চ) কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করা হয়? সেই অধিবেশনে সভাপতি কে ছিলেন?

(ছ) কত সালের কত তারিখে স্বাধীনতা অর্জনের শপথ গৃহীত হয়?

২। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল?

৩। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল?

৪। ডাণ্ডী অভিযানের বিবরণ দাও।

৫। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব কবে গৃহীত হয়? এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

৬। **টীকা লিখ ঃ**

(ক) আজাদ হিন্দ্ ফৌজ; (খ) নৌ বিদ্রোহ; (গ) মন্ত্রিমিশন।

৭। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা আলোচনা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। **একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

(ক) ১৯১১ সালে চীনে যে বিপ্লব ঘটেছিল তার প্রধান দুটি উদ্দেশ্য কি ছিল?

(খ) য়ুয়ানের মৃত্যুর পর কে চীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ?
(খ) চি-জুই কে ছিলেন ?
(গ) রাশিয়ার কোন্ উপদেষ্টা কুওমিনটাং দলের লোকদের সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন ?

২। সুন্-ইয়াৎ-সেন কিভাবে ক্ষমতালাভ করেন ? তাঁর পররাষ্ট্রনীতি কি ছিল ?
৩। ৪ঠা মে-র আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৪। চিয়াং কাই-শেকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর।
৫। দীর্ঘ পরিক্রমা কে কি জন্য করেছিলেন ? দীর্ঘ পরিক্রমার বিবরণ দাও।
৬। মাও সে-তুঙের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**
(ক) ইন্দোচীন কাদের উপনিবেশ ছিল ?
(খ) কার নেতৃত্বে সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
(গ) সেই প্রজাতন্ত্রের কি নাম দেওয়া হয় ?
(ঘ) কোন্ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিয়েতনাম দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ?
(ঙ) ভিয়েতকং কাদের বলা হয় ?
(চ) বাওদাই কে ছিলেন ?
(ছ) কবে ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ?
(জ) অউঙ্গসান যে সংগ্রামী দল গড়ে তুলেছিলেন তার নাম কি ?

২। ইন্দোচীন কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ?
৩। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। ইন্দোনেশিয়ায় কিভাবে গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**
(ক) —— সালে ইংরাজরা মিশরকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেয়।
(খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিশরে একজন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম ——।
(গ) চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে —— নামে জাহাজে।
(ঘ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় —— সালে।

২। অতলান্তিক সনদ কাকে বলে ? কোথায় কি উদ্দেশ্যে এই সনদ রচিত হয়েছিল ?
৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি ?